নিশীথিনী

হুমায়ূন আহমেদ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে,

[শিক্ষার্থীর নাম]

উন্মোচন শিক্ষা পরিবার কর্তৃক আয়োজিত **এসএসসি প্রিপারেশন ব্যাচ-২০২৬** এর **সমন্বিত লেকচার** (১৩২)-এ কৃতিত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে **প্রথম স্থান (১ম)** অর্জন করেছেন।

তাঁর এই সাফল্য অধ্যবসায়, মেধা ও নিষ্ঠার পরিচায়ক। আমরা তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

স্বাক্ষর

উন্মোচন শিক্ষা পরিবার

এই পিডিএফ টি স্টুডেন্টদের বিতরণের জন্য তৈরি করেছে, উন্মোচন শিক্ষা পরিবার, চারঘাট, রাজশাহী। এটি সম্পূর্ণ নন-প্রফিট পিডিএফ।

১

মিসির আলির ধারণা ছিল, তিনি সহজে বিরক্ত হন না। এই ধারণাটা আজ ভেঙে যেতে শুরু করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তিনি অসম্ভব বিরক্ত। যে-রিকশায় তিনি উঠেছেন, তার সীটটা ঢালু। বসে থাকা কষ্টের ব্যাপার। তার চেয়েও বড় কথা, দু' মিনিট পরপর রিকশার চেইন পড়ে যাচ্ছে।

এখন বাজছে দশটা তেইশ। সাড়ে দশটায় থার্ড ইয়ার অনার্সের সঙ্গে তাঁর একটা টিউটরিআল আছে। এটা কোনোক্রমেই ধরা যাবে না। যে হারে রিকশা এগুচ্ছে, তাতে ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতে তাঁর আরো পনের মিনিট লাগবে। এ-কালের ছাত্ররা এতক্ষণ তাদের টীচারদের জন্যে অপেক্ষা করে না।

মিসির আলি তাঁর বিরক্তি ঢাকবার জন্যে একটা সিগারেট ধরালেন। ঠিক তখন পঞ্চম বারের মতো রিকশার চেইন পড়ে গেল। রিকশাওয়ালার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে চেইন পড়ার ব্যাপারটায় সে আনন্দিত। গদাইলশকরী চালে সে নামল এবং সামনের চাকাটা তুলে ঝাঁকাঝাঁকি করতে লাগল!

চেইন পড়ে গেলে কেউ চাকা তুলে ঝাঁকাঝাঁকি করে বলে তাঁর জানা ছিল না। রুক্ষ গলায় বললেন, 'এ রকম করছ কেন?'

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। গরম চোখে তাকাল এবং মিসির আলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে একটা বিড়ি ধরাল। মিসির আলি রাগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কুড়ি থেকে এক পর্যন্ত উল্টো দিকে গুনলেন। জীবনানন্দ দাশের 'মনে হয় একদিন' কবিতার প্রথম চার লাইন মৃদু স্বরে

আওড়ালেন। মিসির আলির ধারণা, কিছু-কিছু কবিতা মানুষের অস্থিরতা কমিয়ে দেয়। 'মনে হয় একদিন' এমন একটি কবিতা।

কিন্তু আজ তাঁর রাগ কমছে না। রিকশাওয়ালা কঠিন মুখ করে নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি টানছে। মিসির আলির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

মিসির আলি নিজেকে সামলাবার জন্যেই ভাবতে লাগলেন—তিনি নিজে যদি সিগারেট ধরাতে পারেন, তাহলে এই লোকটি পারবে না কেন? জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে বেচারা ক্লান্ত ও বিরক্ত। এক জন ক্লান্ত ও বিরক্ত মানুষের নিশ্চয়ই বিশ্রাম করার অধিকার আছে। তিনি হালকা গলায় বললেন, 'নাম কি তোমার?'

'সামসু।'

'বাড়ি কোথায় তোমার সামসু?'

'বাড়ি-ঘর নাই।'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার। সামসু, রিকশা চালাও। ক্লাস মিস হবে।'

সামসু কোনো পাত্তাই দিল না। রাস্তার পাশে পেচ্ছাব করতে বসে গেল। তার বসার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে সে সহজে উঠবে না, বসেই থাকবে। এই লোকটি কি কোনো-একটি অজ্ঞাত কারণে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছে?

মিসির আলি রিকশা থেকে নেমে পড়লেন। পাঁচ টাকা ভাড়া ঠিক করা ছিল, তিনি ছ'টাকা দিলেন। সহজ স্বরে বললেন, 'নাও, ভাড়া নাও। আমি হেঁটে চলে যাব।'

সাধারণত রিকশাওয়ালাদের সবচেয়ে ময়লা ন্যাতন্যাতে নোটগুলো দেয়া হয়। মিসির আলি তাকে দিয়েছেন কচকচে নতুন নোট। এটা তিনি করলেন এই আশায়, যাতে সামসু নামের এই উদ্ধত যুবকটি তাঁর আচরণের জন্যে লজ্জিত বোধ করে।

এ-রকম কাণ্ডকারখানা মিসির আলি সাহেব করে থাকেন। একবার বাসে তাঁর পাশে সুখী-সুখী চেহারার এক বুড়ো বসল। দু' জনের সীট। কিন্তু বুড়ো অকারণে পা ফাঁক করে তাঁকে চাপ দিতে লাগল। বিশ্রী কাণ্ড! মিসির আলি খানিকক্ষণ চাপ সহ্য করলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, 'আপনার বোধহয় অল্প জায়গায় বসার অভ্যেস নেই, আপনি বরং একাই এখানে আরাম করে বসুন।'

মিসির আলি ভেবেছিলেন, লোকটি এতে লজ্জিত ও বিব্রত হবে। সে-রকম কিছু হল না। লোকটি নির্বিকার ভঙ্গিতে দু' জনের জায়গা দখল করে পা দোলাতে লাগল। এরা অসুখী মানুষ। নিজেদের ব্যক্তিগত যন্ত্রণা এরা–অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ঢাকা শহরে অসুখী মানুষের সংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে কেন ভাবতে ভাবতে মিসির আলি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। মাথার ওপর জুন মাসের গনগনে আকাশ। রাস্তাঘাট তেতে উঠেছে। বাতাসের লেশমাত্রও নেই। এ-বছর অসম্ভব গরম পড়েছে। এই অসহ্য গরমে রিকশাওয়ালারা মানুষ টানে কীভাবে কে জানে! মিসির আলি সামসু নামের উদ্ধত যুবকটির জন্যে এক ধরনের মায়া অনুভব করলেন।

ক্লাস ফাঁকা। আসমানী রঙের জামদানি শাড়ি পরা একটি মেয়ে শুধু সেকেন্ড বেঞ্চে বসে আছে। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা। এটা একটা নতুন ব্যাপার। ইউনিভার্সিটির মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দেয় শুধু আজানের সময়।

মিসির আলি ঢুকতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। তিনি অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, ‘দেরি করে ফেললাম। সবাই চলে গেছে নাকি?’

‘জ্বি স্যার।’

‘তুমি বসে আছ কেন? তুমি কেন ওদের সঙ্গে গেলে না?’

মেয়েটি মৃদু স্বরে বলল, ‘স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?’

‘হ্যাঁ, চিনতে পারছি। তোমার নাম নীলু।’

‘জ্বি।’

‘তুমি তো এই ক্লাসের নও।’

‘জ্বি-না।’

‘তাহলে?’

‘আমি স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসে আছি। আমি রুটিনে দেখেছি, আজ আপনার এখানে ক্লাস।’

মিসির আলি ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘তোমার কি বিয়ে হয়েছে? মাথায় ঘোমটা, তাই বললাম। নতুন বিয়ে-হওয়া মেয়েরা প্রথম দিকে ঘোমটা পরে।’

‘আমার বিয়ে হয় নি।

‘ও, আচ্ছা।’

‘আপনার সঙ্গে আমার খুব একটা জরুরি কথা আছে স্যার।’

‘বল।’

‘আমি স্যার অনেকটা সময় নিয়ে কথাটা আপনাকে বলতে চাই। আমি কি স্যার আপনার বাসায় যেতে পারি?’

‘বাসায় আমার কিছু ঝামেলা আছে।‘

‘তাহলে স্যার, আপনি কি আমাদের বাসায় একটু আসবেন? আমার খুব দরকার।’ঠিক আছে, যাব।’

‘আমাদের বাসার ঠিকানা কি আপনার মনে আছে? এক বার গিয়েছিলেন আমাদের বাসায়। আমাদের বাসার দোতলায় আপনার এক জন পরিচিত মহিলা থাকতেন। রানু নাম।’

‘আমার মনে আছে।‘

‘স্যার, আপনি কি আজই আসবেন? আমার খুব দরকার।’

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে। এই মেয়ের নাম নীলু, কিন্তু কোনো-এক বিচিত্র কারণে তাকে অবিকল রানুর মতো দেখাচ্ছে।

‘স্যার, আপনি কি আজই যাবেন?’

‘ঠিক আছে রানু।’

‘আমার নাম কিন্তু স্যার নীলু।’

মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটা হাসছে। যেন তাকে রানু বলায় সে খুশি। এটাই যেন আশা করছিল।

‘আমাদের বাসার ঠিকানা কি লিখে দেব?’

'লিখে দিতে হবে না। আমার মনে আছে।'

'আসবেন কিন্তু স্যার।'

'আসব। আমি আসব।'

'যাই স্যার, স্লামালিকুম।'

নীলু উঠে দাঁড়াল। এত সুন্দর মেয়েটি। শ্যামলা গায়ের রঙ। চোখে-মুখে তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু তবু এমন মায়া জাগিয়ে তুলছে কেন? মিসির আলি লজ্জিত বোধ করলেন। তাঁর বয়স একচল্লিশ। এই বয়সের এক জন মানুষের মনে এ-জাতীয় তরল ভাব থাকা উচিত নয়। তা ছাড়া এই মেয়েটি তাঁর ছাত্রী।

মিসির আলি শূন্য ক্লাসে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। একসঙ্গে বেশ কয়েকটা জিনিস নিয়ে তিনি ভাবছেন। মেয়েটির মাথায় ঘোমটা কেন? এই মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাসে আসছে না কেন? মেয়েটি চলে যাবার সময়ও একটা অস্বাভাবিক আচরণ করেছে। সোজাসুজি হেঁটে গেছে, এক বারও পেছনে ফিরে তাকায় নি। মেয়েরা সাধারণত পেছন ফিরে তাকায়।

সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপারটি হচ্ছে, একটি মৃতা মেয়ের ছাপ আছে নীলুর মধ্যে। যেভাবেই হোক আছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না।

তিনি সিগারেট ধরালেন।

প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না–কথাটা কি সত্যি? তাঁর মনে হল, সত্যি নয়। প্রকৃতির কাজই হচ্ছে নানান রকম রহস্য সৃষ্টি করা–মানুষের কাজ হচ্ছে

সেই রহস্যের কুয়াশা সরিয়ে দেয়া। এমন একদিন কি আসবে, যখন কেউ বলবে না–দেয়ার আর মেনি থিংকস ইন হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ · · ·।

‘আরে, মিসির আলি সাহেব না? এখানে কী করছেন? একা-একা ক্লাসে বসে আছেন কেন?’

তিনি দাড়িওয়ালা এই লোকটাকে চিনতে পারলেন না। হাতে রেজিস্ট্রি খাতা, কাজেই অধ্যাপক হবেন! মুখখানা হাসি-হাসি। পান খেয়ে দাঁত লাল করে ফেলেছেন। পান-খাওয়া লোকজন কি কিছুটা নম্র স্বভাবের হয়? মিসির আলির মনে হল, পান এবং স্বভাবের ভেতর কোনো-একটা সম্পর্ক আছে। তিনি যে ক’ জন পানবিলাসী লোককে চেনেন, তাদের সবাই সদালাপী।

‘কি, কথা বলছেন না কেন? কিছু ভাবছেন নাকি?’

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত ও নরম স্বরে বললেন, ‘জ্বি-না, কিছু ভাবছি না।’

‘আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না?’

‘জ্বি-না।’

দাড়িওয়ালা অধ্যাপক অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। মিসির আলি বিব্রত বোধ করলেন। কাউকে চিনতে পারছি না বলা–তাকে প্রায় অপমান করার শামিল। বিশেষ করে অধ্যাপক শ্রেণীর মানুষরা এ ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর।

‘সত্যি চিনতে পারছেন না?’

'জ্বি না। আমার একটা প্রবলেম আছে, কিছুই মনে থাকে না।'

'মাসখানেক আগে আমি আপনার কাছে এক জন রোগী নিয়ে গিয়েছিলাম– ফিরোজ নাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনি ফিরোজের দুলাভাই।'

'হ্যাঁ দুলাভাই।'

'এবং আপনার নাম হচ্ছে নাজিমুদ্দিন। হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট।'

'এই তো চিনতে পারছেন।'

'চিনতে পারছি এসোসিয়েশন থেকে। একটা মনে পড়লে, অন্যগুলো মনে পড়তে থাকে। এসোসিয়েশন অব আইডিয়াস।'

'ফিরোজ তো অনেকখানি ইমপ্রুভ করেছে। এত অল্প সময়ে যে আপনি এতটা করবেন, আমরা কেউ কল্পনাও করি নি। দারুণ ব্যাপার।'

মিসির আলি কিছু বললেন না। ফিরোজ আজ বিকেলে তাঁর কাছে আসবে। প্রতি সোমবার ফিরোজের সঙ্গে তাঁর একটি সেশন হয়। অথচ নীলুকে বলে রেখেছেন, আজ যাবেন তাদের বাসায়। তাঁর কাজকর্ম ইদানীং এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন? বয়স বাড়ছে।

'মিসির আলি সাহেব।'

'জ্বি?'

'চলুন, লাউঞ্জে বসে চা খাওয়া যাক।'

'চলুন।'

'আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? কী ভাবছেন এত?'

'কিছু ভাবছি না।'

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘনিঃশ্বাসটি কেন ফেললেন, এই নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন। অকারণে তো কেউ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে না। সবকিছুর পেছনেই কারণ থাকে। এই জগতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না, সবই লজিক। জটিল লজিক। জটিল কিন্তু অভ্রান্ত। লজিকের বাইরে এক চুলও কারোর যাবার ক্ষমতা নেই।

২

গত দু' মাস ধরে ফিরোজ প্রতি সোমবারে মিসির আলির কাছে আসে। পাঁচটার সময় আসে, থাকে সাতটা পর্যন্ত। আজ কী মনে করে তিনটার সময় চলে এসেছে। মিসির আলি তখনো ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরেন নি। তাঁর কাজের মেয়ে হানিফা দরজা খুলে দিল। সে দরজা খুলল ভয়ে ভয়ে। ফিরোজের দিকে তাকালেই তার বুক টিপটিপ করে। বড় ভয় লাগে।

'স্যার কি আছেন, হানিফা?'

'জ্বি না।'

'আজ একটু সকাল-সকাল এসে পড়েছি। আমি বসি, কেমন?'

'জ্বি আইচ্ছা।'

'তুমি আমাকে এক গ্লাস লেবুর শরবত খাওয়াতে পার? প্রচণ্ড গরম।'

হানিফার বয়স দশ। কিন্তু সে খুবই চটপটে। মিসির আলি সাহেব তাকে অল্পদিনের মধ্যেই বর্ণপরিচয় করিয়েছেন। পড়াশোনার ব্যাপারে তার

অসম্ভব আগ্রহ। মেয়েটি এমনিতেও চটপটে। সে বড় এক গ্লাস শরবত বানাল। তিন টুকরা বরফ ছেড়ে দিল। ট্রেতে করে শরবতের গ্লাস এবং আরেক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে গেল। সে দেখেছে শরবত খাবার পরপরই সবাই পানি খেতে চায়।

ফিরোজ অবশ্যি উল্টোটা করল। পানি খেল প্রথমে। তারপর বেশ সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, 'তুমি আমাকে ভয় পাও কেন হানিফা?'

'ভয় পাই না তো।'

'পাও, খুবই ভয় পাও। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি এখন সেরে গেছি। পুরোপুরি না-সারলেও অসুখটা আর নেই। চেঁচামেচি হৈচৈ কিছুই করি না। ঠিক না?'

'জ্বি, ঠিক।'

'এখন দেখ না–সবাই একা-একা ছেড়ে দেয়। আগে ছাড়ত না।'

হানিফা কিছু বলল না।

'ফ্যানটা ছেড়ে দাও।'

হানিফা ফ্যান ছেড়ে দিল। ফিরোজ ভারি গলায় বলল, 'এই গরমে সুস্থ মানুষই পাগল হয়ে যায়, আর আমি তো এমনিতেই পাগল।'

হানিফার বুকের ভেতর ধক করে উঠল। বলে কী এই লোক! বাড়িতে আর কেউ নেই। শুনশান নীরবতা। হানিফার ইচ্ছা করতে লাগল, বাড়ির বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

'হানিফা।'

'জ্বি?'

'আমাকে ভয় লাগছে?'

'ভয়ের কিছু নেই। আমি সেরে গেছি। ঠিক আছে–তুমি যাও। আমি বসে থাকব চুপচাপ।'

হানিফা রান্নাঘরে চলে গেল। কি মনে করে সে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। কেন জানি দারুণ ভয় করতে লাগল তার।

ফিরোজ বসে আছে চুপচাপ। তার চোখ ঈষৎ লাল। খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও তার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। ছেলেটির বয়স বাইশ, অত্যন্ত সুপুরুষ। চিবুক এবং ঠোঁট কিশোরীদের মতো। বড়-বড় চোখ, পাতলা নাক। তাকে দেখলে মনে হয়, মেয়ে বানাতে গিয়ে প্রকৃতি কী মনে করে শেষ মুহূর্তে তাকে পুরুষ বানিয়েছে, এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কিছু কাঠিন্য ঢেলে দিয়েছে।

ফিরোজের সমস্যাটা শুরু হয় এইভাবে–সে দু' বছর আগে জানুয়ারি মাসে তার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। যাবার উদ্দেশ্য ছিল একটাই–গ্রাম দেখা। ফিরোজ কখনো গ্রাম দেখে নি।

.

বন্ধুর বাড়ি ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে। চমৎকার একটা জায়গা। ভোরবেলায় আকাশের গায়ে নীলাভ গারো পাহাড় দেখা যায়। চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর, বর্ষা আসামাত্র যা পানিতে ডুবে যায়। সেই পানি সমুদ্রের মতো গর্জন করতে থাকে। অল্প বাতাসেই সমুদ্রের মতো বিশাল ঢেউ ওঠে।

এখন অবশ্যি শুকনো খটখট করছে চারদিকে। তবু ফিরোজ মুগ্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে মুগ্ধ হল বন্ধুর বাড়ি দেখে–বিশাল এক দালান। সিনেমাতে পুরনো আমলের জমিদার বাড়ির মতো বাড়ি। একেকটি ঘর এত উঁচু এবং এত বিশাল যে, কথা বললেই প্রতিধ্বনি হয়।

ফিরোজের বন্ধুর নাম আজমল চৌধুরী। সে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ি দেখাল। অতিথিদের থাকবার জায়গা। নায়রীদের থাকবার জায়গা। কুয়োতলা। বাড়ির পেছনের সারদেয়াল, যেখানে পূর্বপুরুষদের কবর আছে। ফিরোজের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কী কাণ্ড! সে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, ‘এ তো হুলস্থুল ব্যাপার রে আজমল! তোরা রাজা-মহারাজা ছিলি–তা তো কোনোদিন বলিস নি!’

‘এখন কিছুই নেই। দালানটাই আছে, আর কিছুই নেই। সেই দালানই ভেঙে ভেঙে পড়ছে। আরেকটা ভূমিকম্প হলে গোটা দালানই ভেঙে পড়ে যাবে। তা ছাড়া খুব সাপের উপদ্রব।’

‘বলিস কী!’

‘এখন ভয় নেই কোনো। সব সাপ হাইবারনেশনে চলে গেছে। গরমের সময় ভয়াবহ কাণ্ড হয়।’

‘কোনো ব্যবস্থা করতে পারিস না?’

আজমল কঠিন স্বরে বলল, ‘এর একটামাত্র ব্যবস্থাই আছে, সব ছেড়েছুড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া।’

এত চমৎকার ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি, বলিস কী!’

'চলে যাব। এখানে থাকলে মারা পড়তে হবে। তিনটামাত্র মানুষ আমরা। আমি, মা আর আমার ছোটবোন। এত বড় বাড়ি দিয়ে আমি করব কী? জঙ্গল হয়ে গেছে চারদিকে, দেখছিস না?'

দু' দিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে ফিরোজ গিয়েছিল, কিন্তু পঞ্চম দিনেও সে ফেরার কথা কিছু বলল না।

.

বড় আনন্দে সময় কাটতে লাগল। গ্রাম যে এত ইন্টারেস্টিং হবে, তা তার ধারণার বাইরে ছিল। শুধু একটি খটকা লেগে থাকল তার মনে। আজমলের বোনের সঙ্গে তার দেখা হল না, যদিও মেয়েটি এই বাড়িতেই থাকে। মেয়েটির নাম–নাজ। আজমলের মা প্রায়ই তাঁর মেয়েকে চিকন গলায় ডাকেন, 'ও নাজ, ও নাজ।' তার উত্তরে মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে সাড়া দেয়। মেয়েটির সাড়াশব্দ এইটুকুই। ফিরোজ এক বার ভেবেছিল, আজমলকে তার বোনের কথা জিজ্ঞেস করে। শেষ পর্যন্ত তা করা হয় নি। প্রাচীনপন্থী একটি পরিবার, হয়তো কিছু মনে করে বসবে। এদের হয়তো কঠিন পর্দার ব্যাপার আছে।

ষষ্ঠ দিন সন্ধ্যায় মেয়েটির সঙ্গে ফিরোজের দেখা হয়ে গেল। ফিরোজ অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। চারদিক অন্ধকার। ঘরে মালো দিয়ে যায় নি। ফিরোজ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেই হকচকিয়ে গেল। সতের-আঠার বছরের একটি মেয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার এক হাতে একটি হারিকেন। হারিকেনের আলো পড়েছে মেয়েটির মুখে। এই

মুখ কি কোনো মানবীর মুখ? অসম্ভব! পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত রূপ কি এই মুখে আঁকা নয়? ফিরোজ চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইল–পারল না। সে তাকিয়েই রইল।

মেয়েটি বলল, 'আমি নাজনীন।'

কিছু-একটা বলতে হয়। ফিরোজ বলতে পারল না। কোনো কথা তার মনে এল না। এই অসম্ভব রূপবতী মেয়েটিকে সে কী বলবে?

'ভাইয়া বাজারে গেছে, এসে পড়বে। আপনি বড় ঘরে বসুন–চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ফিরোজ বড় ঘরের দিকে রওনা হল আচ্ছন্নের মতো, এবং সে মনে করতে পারল না মেয়েটির গায়ে শাড়ি ছিল, না সালোয়ার-কামিজ ছিল। মেয়েটির চুল কি বেণী-বাঁধা ছিল, না খোলা ছিল। তার মুখটি কি গোলাকার, না লম্বাটে। কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে একটি তুলি দিয়ে আঁকা মুখ সে দেখে এসেছে। যে-শিল্পী ছবিটি এঁকেছেন তাঁর বাস এ পৃথিবীতে নয়–অন্য কোনো ভুবনে।

.

রাতে খাবার সময় আজমল সহজ স্বরে বলল, 'নাজের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে, তাই না? নাজ বলছিল।'

ফিরোজ কিছু বলল না। আজমল বলল, 'ও কিছুতেই তোর সামনে আসতে চাচ্ছিল না। দেখাটা সে-জন্যেই এমন হঠাৎ হয়েছে।'

'আসতে চাচ্ছিল না কেন?'

'লজ্জা। ওর পোলিওতে একটা পা নষ্ট। এই লজ্জায় সে কারো সামনে পড়তে চায় না।'

আজমলের মুখ কঠিন হয়ে গেল। সে রুক্ষ স্বরে বলল, 'পৃথিবীর সমস্ত লজ্জা তার মধ্যে। শুধু তোর সামনে কেন, কারো সামনেই সে যায় না।'

সমস্ত রাত ফিরোজ এক ফোঁটা ঘুমতে পারল না। এত কষ্টের রাত তার জীবনে আসে নি। এবং ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটল পরদিন দুপুরে।

সে একা-একা শিয়ালজানি খালের পাড় ধরে হাঁটতে গেল। এবং তার এক ঘন্টার মধ্যেই চার-পাঁচ জন লোক তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। তার চোখ লাল টকটক করছে। দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কথাবার্তা অসংলগ্ন। মাঝে-মাঝে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠছে এবং দৌড়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

আজমল এবং তার মা হতভম্ব। নাজনীন সমস্ত ব্যাপার দেখে অনবরত কাঁদছে। বাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে মানুষে। নানান জল্পনা-কল্পনা। খারাপ বাতাস লেগেছে। জিনে ধরেছে। কালীর আছর হয়েছে।

ফিরোজকে নিয়ে আসা হল ঢাকায়। সারিয়ে তুললেন মিসির আলি সাহেব। সেই সারানোর ব্যাপারটা সাময়িক। কিছুদিন সুস্থ থাকে, আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। লোকজনদের গলা টিপে ধরতে চায়। জিনিসপত্র ভেঙে একাকার করে।

তবে এখন অবস্থা অনেক ভালো। অসুস্থতার সময় আগের মতো ভায়োলেন্ট হয় না। চুপ করে থাকে। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না।

খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বসে থাকে। ঘর থেকে শুধু বিড়বিড় শব্দ শোনা যায়। যেন সে কারো সঙ্গে কথা বলছে।

যখন সে সুস্থ থাকে, তখন তার অসুস্থ অবস্থার কথা বিশেষ মনে থাকে না। মিসির আলি সাহেব খুঁটিয়ে খুটিয়ে যা বের করেছেন, তা খাতায় লিখে রেখেছেন। লেখা হয়েছে ফিরোজের জবানিতে।

অসুস্থতার বিবরণ

সারা রাত নানান কারণে আমার ঘুম হয় নি। শেষরাতের দিকে একটু ঘুম এল। তাও অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। ছ'টার সময় বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখি, আজমল একটা চাদর গায়ে দিয়ে আমবাগানে রোদের জন্যে অপেক্ষা করছে। চট করে রোদ উঠবে মনে হল না। কারণ খুব কুয়াশা। আমি লক্ষ করেছি, আটটা-ন'টার আগে এ অঞ্চলে সূর্যের দেখা পাওয়া যায় না।

আজমল আমাকে দেখে বলল, 'আজ এত সকাল-সকাল উঠলি যে? চোখ লাল কেন? রাতে ঘুম হয় নি।?'

'হয়েছে।'

'চা খাবি এক কাপ? নাশতা হতে দেরি হবে। চাল কোটা হচ্ছে, পিঠা হবে। সময় লাগবে।'

'চা এক কাপ খাওয়া যায়।

চা খেতে-খেতে পাখি শিকার নিয়ে কথা হল। এখান থেকে প্রায় মাইল চারেক দূরে পুকইরা বিলে নাকি খুব হাঁস নামছে। শেষ রাতে উঠে গেলে প্রচুর পাওয়া যাবে।

আমি হাঁস মারার ব্যপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালাম, কিন্তু আজমলের কাছ থেকে কোনোরকম সাড়া পাওয়া গেল না। অথচ এখানে যার সঙ্গেই দেখা হয়, সেই জিজ্ঞেস করে পাখি শিকার করতে এসেছি কি না। আজমলের এ রকম অনাগ্রহের কারণ নাশতা খাবার সময় টের পাওয়া গেল। এদের পাখি মারার কোনো বন্দুক বর্তমানে নেই। একটা দোনলা উইনস্টন গান ছিল। অর্থনৈতিক কারণে বিক্রি করে ফেলতে হয়েছে। শিকারের প্রসঙ্গ উঠতেই এই কারণেই আজমল মন খারাপ করেছে। আমার নিজেরও তখন একটু খারাপ লাগল। শিকারের প্রসঙ্গটা না তুললেই হত।

রোদ উঠল দশটার দিকে। আমি ভেবেছিলাম, আজমলের সঙ্গে বাজারের দিকে যাব। কিন্তু আজমল বলল, 'তুই থাক, আমি দেখি একটা বন্দুকের ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

আমি বললাম, 'বন্দুকের ব্যবস্থা করার কোনো দরকার নেই। শিকারের দিকে আমার কোনো ঝোঁক নেই।'

আজমল আমার কোনো কথা শুনল না। সে অসম্ভব জেদি। আমাকে রেখে চলে গেল। আমার তেমন—কিছু করার নেই। শিয়ালজানি খাল ধরে ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

এ-অঞ্চলে হিন্দু বসতি খুব বেশি। এদের ঘর-দুয়ার খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখতে ভালো লাগে। তবে অনেক বাড়ি-ঘর দেখলাম ফাঁকা। আজমলের কাছে শুনেছি, অনেক হিন্দু পরিবার একাত্তুরের যুদ্ধে কলকাতা গিয়ে আর ফিরে আসে নি। বেশ কিছু মারা পড়েছে পাকিস্তানি আর্মির হাতে। এদের

ঘর-বাড়ি ফাঁকা। বড় বড় ঘাস জন্মেছে। জনমানবশূন্য বাড়ি-ঘর দেখতে কেমন যেন ভয়ভয় লাগে। গা ছমছম করে।

আমি ঠিক করলাম বাড়ি ফিরে যাব। চড়চড় করে রোদ উঠছে। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দুর চলে এসেছি। যে-জায়গাটায় আছি, তা অসম্ভব নির্জন। আমি বিশাল একটা বকুলগাছের নিচে দাঁড়ালাম খানিকক্ষণ। তখনই ব্যাপারটা ঘটল। গরগর একটা শব্দ শুনলাম গাছে। যেন কেউ গাছের ডাল নাড়াচ্ছে। আমি চমকে গাছের দিকে তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে গেল।

দেখলাম, গাছের ডালে এক জন মানুষ বসে আছে। খালি গা। পরনে একটা প্যান্ট। চোখে গোল্ড রিম একটা চশমা। লোকটি রোগা এবং দারুণ ফর্সা। মুখের ভাব অত্যন্ত রুক্ষ। সে সাপের মতো সরসর করে নেমে এল। এক জন মানুষ গাছ থেকে নেমে আসার মধ্যে তেমন অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু আমার শরীর কাঁপতে লাগল। ঘামে গা চটচটে হয়ে গেল। লোকটির দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ। চশমার কাঁচের আড়ালেও তার চোখ চকচক করছে। সে এক পা এক পা করে এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা করছিল ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু আমার পা যেন মাটিতে লেগে গেছে। নড়বার সামর্থ্য নেই। লোকটির কাছ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা নেই। সে এগিয়ে এল আমার দিকে, তারপর একটা চড় বসিয়ে দিল। এর পরের ঘটনা আমার আর কিছুই জানা নেই।

মিসির আলি সাহেব তাঁর ছোট-ছোট অক্ষরে প্রচুর নোট লিখেছেন। প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠার একটি বিশ্লেষণী প্রবন্ধও আছে ইংরেজিতে লেখা। কিছু পয়েন্টস আছে আন্ডারলাইন করা। দু'-একটি পয়েন্ট এ রকম :

১। ফিরোজের গল্পে বেশ কিছু মজার ব্যাপার আছে। সে চশমা-পরা একটি লোককে নেমে আসতে দেখল খালিগায়ে। কিন্তু তার পরনে আছে প্যান্ট। যে-লোকটি চশমা এবং প্যান্ট পরে, সে খালিগায়ে থাকে না। লুঙ্গি-পরা একটি লোক খালিগায়ে নেমে এলে বাস্তব চিত্র হত। ফিরোজ দেখেছে একটি অবাস্তব চিত্র। অবাস্তব চিত্রগুলো আমরা দেখি স্বপ্নে। ফিরোজ কি একটি স্বপ্নদৃশ্যের বর্ণনা করছে?

২। ফিরোজ বলছে লোকটির পরনে ছিল প্যান্ট। কিন্তু প্যান্টের রঙ কী, তা সে বলতে পারছে না। তার মানে কি এই যে, প্যান্টের কোনো রঙ ছিল না। স্বপ্নদৃশ্য সবসময় হয় সাদা-কালো। স্বপ্ন বর্ণহীন। অবশ্যি সে একটি রঙ স্পষ্ট উল্লেখ করছে। সেটি হচ্ছে চশমার ফ্রেমের রঙ। সে বলছে গোল্ড রিম চশমা। অর্থাৎ সে সোনালি রঙ দেখতে পাচ্ছে, স্বপ্ন দৃশ্যে যা সম্ভব নয়।

৩। তার গল্পের কোথাও সে নাজনীন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নি। আমার মনে হচ্ছে, ফিরোজের সমস্ত ব্যাপারটায় নাজনীনের একটি ভূমিকা আছে। অসুস্থ হবার আগের রাত সে অনিদ্রায় কাটিয়েছে। অনিদ্রার মূল কারণ রূপবতী একটি মেয়ে। আমি লক্ষ করেছি, আমার সঙ্গে কথাবার্তার সময়ও সে এই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যায়। কেন যায়?

৪। সে তার গল্পে বলেছে, সে একটি বকুলগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু যে-গাছের নিচে সে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা একটা বটগাছ। ফিরোজ বকুলগাছ এবং বট গাছের পার্থক্য জানবে না, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে গাছের নিচে আসার আগেই একটি ঘোরের ভেতর ছিল বলে আমার ধারণা। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস বকুলগাছ প্রসঙ্গে তার কোনো একটি পীড়াদায়ক স্মৃতি আছে। (পরে বকুলগাছ প্রসঙ্গে আরো তথ্যাদি আছে)।

৫। ফিরোজের চশমাপরা লোকটি ছিল ফর্সা, রোগা ও লম্বা, যার চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বর্ণনা আজমলের বেলায়ও খাটে। এই ছেলেটি অসম্ভব ফর্সা, রোগা এবং লম্বা। সে অবশ্যি চশমা পরে না, মেডিকেল কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়বার সময় তার চশমা ছিল। এবং সেটা ছিল গোল্ড রিম চশমা। সেই সময় ফিরোজ এবং আজমল ছিল রুমমেট।

ফিরোজ প্রসঙ্গে ইংরেজিতে কিছু নোট আছে। নোটগুলোর বঙ্গানুবাদ দেয়া হল :

বকুলগাছ বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমার প্রাথমিক অনুমান ছিল বকুলগাছ প্রসঙ্গে ফিরোজের একটি পীড়াদায়ক স্মৃতি আছে। অনুমান মিথ্যা নয়। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ফিরোজরা একসময় সিলেটের মীরবাজারে থাকত। তার বাসা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটি বকুলগাছ ছিল। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা খুব ভোরবেলায় বকুল ফুল কুড়াতে যেত।

ফিরোজের বয়স তখন আট বছর। সে তার বড় বোনের সঙ্গে এক ভোরবেলায় ফুল কুড়াতে গিয়ে একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখল। একটি নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ দড়িতে ঝুলছে। এটি একটি হত্যাকাণ্ড। মেয়েটিকে মেরে দড়িতে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

অল্পবয়স্ক একটি শিশুর কাছে নগ্ন নারীদেহ এমনিতেই যথেষ্ট অস্বাভাবিক। সেই দেহটি যদি প্রাণহীন হয়, তাহলে তা সহ্য করা মুশকিল!

ফিরোজ অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রবল জ্বর এবং ডেলিরিয়াম। শৈশবের এই দৃশ্য ফিরোজের মস্তিষ্কের নিউরোনে জমা আছে, তা বলাই বাহুল্য।

.

মিসির আলি সাহেব বাড়ি ফিরলেন পাঁচটা বাজার কিছু পরে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ক্ষণেক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। ঝাঁকে-ঝাঁকে কাক উড়ছে আকাশে। ঝড় হবে সম্ভবত। পশু-পাখিরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর আগে-আগে পায়।

ঘরে ঢুকে যে-দৃশ্যটি দেখলেন, তার জন্যে মিসির আলির মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। ফিরোজ বসে আছে মূর্তির মতো। তার হাতে একটা লোহার রড। সে শক্ত হাতে রড চেপে ধরে আছে। এত শক্ত করে চেপে ধরে আছে যে, তার হাতের আঙুল সাদা হয়ে আছে। চামড়ার নিচের শিরা। হয়ে ফুলে উঠেছে।

রড সে পেল কোথায়? এই প্রশ্নটির উত্তর পরে ভাবলেও হবে। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁকে বুঝতে হবে, ফিরোজ এ-রকম আচরণ কেন করছে। তিনি

সহজ স্বরে বললেন, 'একটু দেরি করে ফেললাম। তুমি কি অনেকক্ষণ হয়েছে এসেছ নাকি?'

ফিরোজ জবাব দিল না। তার চোখ টকটকে লাল। নিঃশ্বাস ভারি। কী সর্বনাশের কথা! মিসির আলি প্রাণপণে চেষ্টা করলেন স্বাভাবিক থাকতে 'বুঝলে ফিরোজ, খুব ঝড়-বৃষ্টি হবে। আকাশ অন্ধকার হয়েছে মেঘে। তোমার হাতে ওটা কি লোহার রড নাকি?'

'হুঁ।'

'লোহার রড নিয়ে কী করছ? দাও, রেখে দিই।'

'না।'

'চা-টা কিছু খেয়েছ?'

ফিরোজ কোনো জবাব দিল না। তার দৃষ্টি তীব্র ও তীক্ষ্ণ।

'সিগারেট খাবে? নাও, একটা সিগারেট ধরাও।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, ফিরোজ রড ছেড়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল। মনে হচ্ছে একটা ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানো গেছে। সিগারেট শেষ না-হওয়া পর্যন্ত সে এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সিগারেট শেষ হতে লাগবে তিন মিনিট। তিন মিনিট যথেষ্ট দীর্ঘ সময়।

'তোমার জ্বর নাকি ফিরোজ?'

ফিরোজ জবাব দিল না। মিসির আলি তার কপালে হাত দিলেন। গা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। মিসির আলি বললেন, 'হুঁ, বেশ জ্বর তো! একটা ট্যাবলেট খেয়ে নাও, জ্বরটা কমবে।'

তিনি ড্রয়ার খুলে এক শ' মিলিগ্রাম লিব্রিয়ামের ট্যাবলেট বের করলেন। অত্যন্ত কড়া ঘুমের অষুধ। কোনোরকমে খাইয়ে দিতে পারলে সঙ্গে-সঙ্গে কাজ করবে। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে গিয়ে ধরবে। মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ কমে আসবে। উত্তেজিত অংশগুলোর উত্তেজনা দ্রুত হ্রাস পাবে। লিব্রিয়াম একটি চমৎকার অষুধ।

'নাও ফিরোজ, খেয়ে নাও।'

ফিরোজ কোনোরকম আপত্তি ছাড়াই অষুধ খেয়ে ফেলল। রক্তে অষুধ মেশবার জন্যে সময় দিতে হবে। বেশি নয়, অল্প কিছু সময়। এই সময়টা গল্পগুজবে আটকে রাখতে হবে।

'চা খেলে কেমন হয় ফিরোজ? বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে চা-টা জমবে মনে হয়। খাবে?'

'হুঁ, খাব।'

'বস, আমি চা নিয়ে আসছি। কিংবা এক কাজ কর। শুয়ে পড় সোফায়– আরাম কর।'

মিসির আলি বেরিয়ে এলেন। শোবার ঘরের দরজা লাগিয়ে এলেন বারান্দায়। এখন তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। ফিরোজকে বারান্দায় এলে দরজা ভেঙে আসতে হবে। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এর মধ্যেই লিব্রিয়াম তার কাজ করতে শুরু করবে।

মিসির আলি ডাকলেন, 'হানিফা, হানিফা।'

হানিফা রান্নাঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এল। ভয়ে আতঙ্কে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। সে কাঁপছে থরথর করে।

'কী হয়েছিল হানিফা?'

হানিফা কিছু বলতে পারল না। আতঙ্ক এখনো তাকে ঘিরে আছে। মিসির আলি সাহস দেবার জন্যে হানিফার মাথায় হাত রাখলেন। হানিফা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'এই লোকটা একটা লোহার শিক লইয়া আমারে মারতে আইছিল।'

'তারপর?'

'আমি দরজা বন্ধ কইরা বইসা ছিলাম। তারপর শুনি সে কার সাথে যেন কথা কইতেছে!'

'কার সাথে কথা বলছে?'

'অন্য একটা মানুষ।'

'তুমি দেখেছ অন্য কোনো মানুষ?

'জ্বি না, কিন্তু কথা শুনছি। মোটা গলা।'

'ঠিক আছে এখন যাও, ভালো করে এক কাপ চা বানাও। ভয়ের কিছু নেই।'

হানিফা চা বানাতে গেল। মিসির আলি লক্ষ করলেন, মেয়েটির পা এখনো কাঁপছে।

চা বানাতে-বানাতে ঠিক হয়ে যাবে। ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, কোনো-একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা।

মিসির আলি ঘড়ি দেখলেন। দশ মিনিট পার হয়েছে। লিব্রিয়াম নিশ্চয়ই তার কাজ শুরু করেছে। বসার ঘর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। এখন নিশ্চিন্তে সেখানে যাওয়া যায়।

তিনি বসার ঘরে ঢুকলেন। ফিরোজ লোহার রড হাতে বসে আছে। অসুখের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'চা বানাতে বলে এসেছি। চা চলে আসবে।'

ফিরোজ চাপা গলায় বলল, 'আজ আপনার একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার কথা।'

মিসির আলির চমকে ওঠা উচিত, কিন্তু তিনি চমকে উঠলেন না। তিনি জানেন, বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় মানুষের টেলিপ্যাথিক সেন্স প্রবল হয়ে ওঠে। ফিরোজের এখন সেই অবস্থা। সে ব্যাখ্যার অতীত কোনো-একটি উপায়ে তাঁর মস্তিষ্কের বায়ো-কারেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে।

'একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার দেখা করবার কথা না?'

'হ্যাঁ, কথা আছে।'

'তার কাছে গেলে আপনার বিপদ হবে।'

'কী করে বুঝলে?'

আমাকে বলে গেছে।'

'কে বলে গেছে? ঐ চশমাপরা লোক?'

'হ্যাঁ।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন, ফিরোজের চোখের পাতা ঘনঘন পড়তে শুরু করেছে। REM–র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট। লিব্রিয়াম কাজ করতে শুরু করেছে।

তিনি সহজ স্বরে বললেন, 'শোন ফিরোজ, আমি আমার সারা জীবনে আমার নিজের লাভ-ক্ষতির দিকে তাকাই নি। আমি ঐ মেয়েটির কাছে যাব।'

ফিরোজ ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। ফিরোজকে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন তার বাবা- মা।

মিসির আলি ড্রাইভারকে নিয়ে ধরাধরি করে ঘুমন্ত ফিরোজকে গাড়িতে তুলে দিলেন। ড্রাইভারকে বললেন, 'ও অসুস্থ। আজ রাতটা ওকে তালাবন্ধ করে রাখতে হবে। সকালবেলা আমি ওকে দেখতে যাব। আর শোন, ও রাতে বিড়বিড় করে কথাটথা বলবে। একটা ক্যাসেট রেকর্ডারের ব্যবস্থা করতে বলবে, যাতে ওর সমস্ত কথাবার্তা রেকর্ড হয়ে যায়। এটা খুব দরকার।'

ড্রাইভার শুকনো মুখে তাকিয়ে রইল। মিসির আলি ঘরে পা দিতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। সেই সঙ্গে বাতাস। এ-রকম দুর্যোগের রাতে নীলুর কাছে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। মিসির আলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন।

ফিরোজের ব্যাপারে তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ এ-রকম হবে কেন?

৩

বহু খোঁজাখুঁজি করেও মিসির আলি নীলুদের বাড়ি বের করতে পারলেন না। তাঁর কাছে কোনো ঠিকানা নেই। তিনি ইচ্ছা করেই ঠিকানা রাখেন নি। না-রাখাটা বোকামি হয়েছে। কাঁঠালবাগানের যে-অঞ্চলে লাল রঙের দোতলা বাড়ি থাকার কথা, সেখানে লাল রঙের কোনো বাড়িই নেই।

কয়েকটি পান-বিড়ির দোকানদারকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন–লাল রঙের দোতলা বাড়ি, ভেতরে ফুলের বাগান আছে। ওরা যখন শুনল, তিনি ঠিকানা জানেন না এবং বাড়ির মালিকের নামও জানেন না, তখন খুবই অবাক হয়ে গেল।

'ঢাকা শহরে ঠিকানা দিয়াও বাড়ি পাওন যায় না, আফনে আইছেন ঠিকানা ছাড়া! কেমুন লোক আফনে।'

মিসির আলির নিজেরও মনে হল, কাজটা বুদ্ধিমানের মতো হয় নি। স্মৃতির উপর বিশ্বাস করতে নেই। স্মৃতি হচ্ছে প্রতারক। নানানভাবে সে মানুষকে প্রতারণা করে।

অন্য কোনো মানুষ হলে এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে বাড়ি চলে যেত। কিন্তু তিনি ভিন্ন ধরনের মানুষ। কোনো-একটি বিষয় শেষ না দেখে তিনি ছাড়েন না। কাজেই সকাল দশটার সময় তাঁকে দেখা গেল একটা রিকশা

ঠিক করতে। ঘন্টা হিসাবে চুক্তি। এক ঘন্টা সে মিসির আলিকে নিয়ে কাঁঠালবাগানের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরবে। তিনি বাড়ি বের করতে চেষ্টা করবেন।

মিসির আলির কোলে রসমালাইয়ের একটা হাঁড়ি। কি মনে করে যেন তিনি এক সের রসমালাই কিনে ফেলেছেন। ছাত্রীর বাড়িতে খালি হাতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এখন মিষ্টির হাঁড়িটা একটা উপদ্রবের মতো লাগছে। মিসির আলির কেন যেন মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে হাঁড়ি ভেঙে তার সমস্ত শরীর মাখামাখি হয়ে যাবে।

রিকশাওয়ালাটা বুড়ো এবং চালাক। খুব কম পরিশ্রমে সে এক ঘন্টা পার করতে চায়। রিকশা চলছে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে। মিসির আলি বললেন, 'বুড়ো মিয়া, আপনি এই যে আস্তে আস্তে রিকশা চালাচ্ছেন, এতে কিন্তু আপনার কষ্ট বেশি হচ্ছে। প্রতিবারই নতুন করে মোমেনটাম দিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি জোরে চালাতেন, তাহলে মোমেনটামের জন্যে বল দিতে হত এক বার। বাকি সময়টা শুধু ফ্রিকশন কাটানোর জন্যে অল্প কিছু বল লাগত।

বুড়ো রিকশওয়ালাকে এই জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত করতে পারল না। তার রিকশার গতি আরো শ্লথ হয়ে গেল।

মিসির আলি ভাবতে চেষ্টা করলেন, যে-বাড়িতে আগে এক বার এসেছেন, সে-বাড়িটি এখন খুঁজে না-পাওয়ার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে। অনেকগুলো কারণ হতে পারে। পরবর্তী সময়ে হয়তো লাল রঙের

দালানটিকে সাদা রঙ করা হয়েছে। দোতলা ছিল, তিনতলা করা হয়েছে। ফুলের বাগান নষ্ট করে ঘর তোলা হয়েছে। কিংবা এ-ও হতে পারে যে, মস্তিষ্কের যে অংশ বস্তুজগতের আবস্থানিক বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করে নিউরোন স্মৃতিকক্ষে জমা রাখে–তাঁর সেই অংশ কাজ করছে না।

মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ করলেন, তাঁর রসমালাইয়ের হাঁড়ি দু'খণ্ড হয়েছে। সমস্ত গায়ে, রিকশার সীটে এবং নিচে রসে মাখামাখি। এই অবস্থায় নীলুর বাসা খোঁজার কোনো মানে হয় না। অথচ এক ঘন্টা পার হতে এখনো পনের মিনিট বাকি। পনের মিনিট আগে রিকশা ছেড়ে দেবারও প্রশ্ন ওঠে না। তিনি রিকশওয়ালাকে ছায়ায় নিয়ে রিকশা দাঁড় করাতে বললেন। রসে মাখামাখি হয়ে তিনি পনের মিনিট রিকশার সীটে বসে রইলেন। মিষ্টির লোভে তাঁর মাথার ওপর কাক ডাকতে লাগল। দু'-একটা সাহসী কাক ছোঁ মেরে মেরে রসগোল্লার টুকরা ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। বুড়ো রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে তাঁকে দেখছে। সে তার জীবনে এমন বিচিত্র যাত্রী খুব বেশি পায় নি। মিসির আলি বললেন, 'পনের মিনিট পার হলেই আমি চলে যাব, বুঝলেন?'

রিকশাওয়ালা মাথা নাড়ল–সে বুঝেছে।

আজ গরম সে-রকম নেই। কাল রাতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় আজ একটা শীতল ভাব আছে। তা ছাড়া রাস্তাঘাট ঝকঝক করছে। গাছপালায় সতেজ ভাব। কচুরিপানার মতো হালকা বেগুনি ফুল ফুটে আছে জারুল গাছে। কী

চমৎকার যে লাগছে দেখতে! এই ফুলগুলোর জন্যেই চারদিকে একটা কোমল ভাব চলে এসেছে।

.

মিসির আলি বাসায় ফিরলেন এগারটার সময়। বাসায় এক ফোঁটা পানি নেই। একটার দিকে বাড়িওয়ালা কল ছাড়বে। তার আগে গোসলের কোনো সম্ভাবনা নেই। রসমালাইয়ের রস সারা গায়ে মেখে বসে থাকতে হবে। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হানিফাকে চা বানাতে বলে ফিরোজের ফাইল খুলে বসলেন। এই ফাইলটিতে লেখা: ফিরোজ/মোহনগঞ্জ। মোহনগঞ্জে ফিরোজের অভিজ্ঞতা এবং মোহনগঞ্জ প্রসঙ্গে যাবতীয় খবরাখবর এখানে আছে। তিনি মোহনগঞ্জের বিভিন্ন লোকজনের কাছে যে-সব চিঠিপত্র লিখেছেন, তার কপি এবং সেইসব চিঠিপত্রের জবাবও এখানে আছে। মিসির আলি পাতা ওল্টাতে লাগলেন। প্রথম চিঠিটি নাজনীনকে লেখা। তারিখ দেয়া আছে ১৭–৬–৮৫, প্রায় এক বছর আগে লেখা চিঠি। আজ হচ্ছে ১০-৬-৮৬। মিসির আলি নিজের লেখা চিঠির উপর চোখ বোলাতে লাগলেন।

নাজনীন,

কল্যাণীয়াসু, আমার ভালবাসা নাও। পরিচয় দিয়ে নিচ্ছিঃ আমি মিসির আলি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিষয়ের এক জন অধ্যাপক। ফিরোজ খান নামের এক জন মানসিক রোগীর চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাকে চিকিৎসা করা হচ্ছে মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি

পদ্ধতিতে। এই রোগীকে তুমি চেন। ও তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তোমাদের বাড়িতেই। শোন নাজনীন -- মানসিক রোগের উৎপত্তি মনে। মানুষের মন বিচিত্র জিনিস। সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জে যে-রহস্য ও জটিলতা আছে, তার চেয়েও অনেক বেশি রহস্যময় মানুষের মন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে সেই রহস্যের জট খুলতে চেষ্টা করি। প্রায় সময়ই তা সম্ভব হয় না। ফিরোজের বর্তমান যে-অবস্থা, তার কারণ অনুসন্ধান করতে তোমার সাহায্য প্রয়োজন। একটি অসুস্থ ছেলের সাহায্যে তুমি কি এগিয়ে আসবে না? আমি যা জানতে চাই, তা হচ্ছে–ফিরোজের সঙ্গে তোমার ক' বার দেখা হয়েছে এবং কী কী কথা হয়েছে। কোনো কিছু বাদ না দিয়ে আমাকে জানাবে। আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন তথ্যও অর্থবহ হতে পারে। আমার শরীরটা বিশেষ ভালো না। শরীর একটু ভালো হলে তোমাদের বাড়িটা দেখতে যাব। এই ব্যাপারে তোমারই বড় ভাই আজমলের সাথে কথা হয়েছে। আদর ও ভালবাসা নাও।

মিসির আলি

চিঠির উত্তর তিনি এক সপ্তাহের ভেতর পেয়ে গেলেন। তিনি মুগ্ধ হলেন চিঠি পড়ে। সহজ এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে লেখা চিঠি। হাতের লেখা বড় সুন্দর। তার চিঠির অংশবিশেষ এ রকম–

'ভাইয়া যে তার বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে আসবে, তা আমি জানতাম। গরমের ছুটির সময় এসে বলে গিয়েছিল। ভাইয়া সেই কলেজে পড়ার সময় থেকে

তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বেড়াতে আসে। আমাদের বাড়িটা বিশাল। ভাইয়া তার বন্ধুদের এই বাড়ি দেখিয়ে মুগ্ধ করতে চায় বলেই আমার ধারণা। যাই হোক, ভাইয়ার বন্ধুরা এলে আমার খুব ভালো লাগে। বাড়িতে একটা উৎসব-উৎসব ভাব থাকে। ভাইয়ার মেজাজ থাকে খুব খারাপ (আপনি বোধহয় জানেন না, ভাইয়া খুব রাগী)।

এবার যখন ফিরোজ ভাই বেড়াতে এল–আমার মোটেও ভালো লাগে নি। কারণ, ভাইয়ার এই বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসার পেছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল, যা আমার পছন্দ হয় নি। ভাইয়া চাচ্ছিল, আমি তার বন্ধুর সঙ্গে গল্পটল্প করি, চা-টা বানিয়ে দিই। এবং তা করলেই তার বন্ধু আমাকে পছন্দ করে ফেলবে। আমার শারীরিক ক্রুটি তার চোখে পড়বে না। আমার একটি ভালো বিয়ে হবে। ভাইয়ার ধারণা, তার এই বন্ধু পৃথিবীর সেরা মানুষদের এক জন।

মার কাছ থেকে এসব শুনে আমার খুব মন খারাপ হল। একটি ছেলেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিয়ে করতে হবে কেন? বিয়েটা কি এতই জরুরি? আমি ভাইয়াকে ডেকে নিয়ে বললাম, 'আমি কখনো, কোনো অবস্থাতেই তোমার এই বন্ধুর সামনে যাব না।' ভাইয়া চোখ লাল করে বলল, 'যেতেই হবে।' আমি শান্ত গলায় বললাম, 'এটা নিয়ে তুমি যদি জোর খাটাও, আমি তাহলে মরে যাব।' ভাইয়া চুপ করে গেল। আমি শান্ত ধরনের মেয়ে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ভয়ঙ্কর জেদি। ভাইয়া তা খুব ভালোই জানে। সে আমাকে ঘাঁটাল না। আমি ভেতরের বাড়িতে থাকতে লাগলাম। ভুলেও

বাইরে পা বাড়াই না। তবু এক দিন সন্ধ্যায় দেখা হয়ে গেল। ফিরোজ ভাইকে দেখে মনে হল, তিনি খুব অবাক হয়েছেন। আমি হকচকিয়ে গিয়েছি। নিজেকে সামলে নিয়ে কোনোমতে বললাম, 'বড় ঘরে গিয়ে বসুন, সেখানে চা দেয়া হবে।'

এই বলে আমি চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি। পোলিওর জন্যে আমার এক পায়ে কোনো জোর নেই, কাজেই উল্টে পড়ে গেলাম। ফিরোজ ভাই আমাকে টেনে তুললেন। এটাই স্বাভাবিক। এতে লজ্জা বা অপমানের কিছুই নেই। কিন্তু রেগে গেলাম এবং কঠিন গলায় বললাম, 'হাত ছাড়ুন।'

তিনি পাংশুবর্ণ হয়ে গেলেন। আমার হাত ছেড়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।'

মিসির আলি এই চিঠিটা বেশ অনেক বার পড়েছেন এবং প্রতিবারই তাঁর মনে হয়েছে, চমৎকার একটি চিঠি। আন্তরিক এবং কোনো ভান নেই। এক জন মানুষ সবচেয়ে বেশি ভান করে তার চিঠিতে। যে এই ভানের ওপরে উঠে আসতে পারে, তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়।

সুন্দরী একটি মেয়ের মনটাও বোধহয় সুন্দর হয়।

মিসির আলি অন্যমনস্কভাবে খাতার পাতা ওল্টাতে লাগলেন। এখনো পানি আসে নি। আজ কি বাড়িওয়ালা তার পানির পাম্পটি খুলবে না? ওদের নিজেদের কি পানির দরকার হয় না? দুপুরের খাওয়াদাওয়ারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। রান্নাবান্না কিছু হয় নি। হানিফা জ্বরে কাতর। কালকের ঘটনায় বেচারি বেশ ভয় পেয়েছে। সকালে এক শ' এক জ্বর ছিল, এখন

এক শ' দুই। দুটি প্যারাসিটামল কিছুক্ষণ আগেই খাওয়ানো হয়েছে। জ্বর কমে যাওয়া উচিত, কিন্তু কমছে না। বিকেল নাগাদ না—কমলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

তিনি খাতাপত্র গুছিয়ে উঠলেন। উঁকি দিলেন হানিফার ঘরে। হানিফার জন্যে তিনি একটি ঘর দিয়েছেন। এই ঘরে ছোট্ট একটি খাট আছে, পড়ার চেয়ার-টেবিল আছে, একটি আলনা আছে। এই মেয়েটি কোনোদিন কল্পনাও করে নি, কোনোদিন এতগুলো জিনিস তার হবে।

'হানিফা, তোর জ্বর কেমন রে?'

'ভালো।'

মিসির আলি কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন।

'ভালো কোথায়? অনেকখানি জ্বর তো! মাথায় পানি ঢালতে হবে।'

হানিফা জ্বরতপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল। এই লোকটিকে সে বুঝতে পারছে না। এক জন কাজের মেয়ের জন্যে কেউ এতটা দরদ দেখায়, না দেখান উচিত?

'হানিফা।'

'জ্বর খুব বেশি। জ্বর নামাতে হবে। পানি তো বোধহয় এক ফোঁটাও নেই।'

'জ্বি না।'

'যাই, বাড়িওয়ালাকে পাম্প ছাড়তে বলি।'

'বলেন।'

'ফিরোজদের বাড়ি থেকে কেউ এসেছিল?'

'জ্বি-না।'

'টেলিফোন করে একটা খোঁজ নিতে হয়। কী বলিস হানিফা?'

'জ্বি, নেন।'

হানিফা চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার জ্বর বোধহয় বাড়ছে। চোখ ছোট-ছোট হয়ে এসেছে। চোখের সাদা অংশ কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছে। মিসির আলি চিন্তিত মুখে বাড়িওয়ালার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বাড়িওয়ালা করিম সাহেব বাসাতেই ছিলেন। পানি এখনো ছাড়া হয় নি শুনে তিনি

খুব হৈচৈ করতে লাগলেন। বারবার বললেন, 'এই সামান্য কাজের জন্যে আপনি নিজে আসলেন প্রফেসর সাহেব–বড় লজ্জায় ফেললেন আমাকে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

মিসির আলি সাহেব বললেন, 'একটা টেলিফোন করা যাবে করিম সাহেব?'

'একটা কেন, এক শ'টা করা যাবে। যখন ইচ্ছা তখন করা যাবে। দরকার হলে ট্রাংকল করবেন–খুলনা ময়মনসিংহ বরিশাল। টেলিফোনের বিল আবদুল করিমকে কিছু করতে পারবে না, বুঝলেন প্রফেসর সাহেব? ওরে, টেলিফোনটা প্রফেসর সাহেবকে এনে দে। আর দেখ, ঠাণ্ডা পেপসি বা সেভেন আপ কিছু আছে কি না।

'কিছু লাগবে না।'

'আপনি না বললেই হবে নাকি? আপনার একটা ইজ্জত আছে না? ছয় মাসে এক বছরে একবার আসেন। আমি বলতে গেলে রোজই বসে থাকি আপনার ওখানে। আপনি ফ্যানটার নিচে ঠাণ্ডা হয়ে বসেন তো দেখি!'

মিসির আলি বসলেন। বাড়িওয়ালা করিম সাহেব মিসির আলিকে একটু বিশেষ রকম স্নেহ করেন। গত দু'বছরে তিনি প্রতিটি ফ্লাটের ভাড়া তিন দফায় বাড়িয়েছেন, শুধু প্রফেসর সাহেবের ভাড়া এক পয়সাও বাড়ে নি। কেন বাড়ে নি কে জানে?

.

ফিরোজের মাকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। তাঁর কাছ থেকে যে-সমস্ত তথ্য জানা গেল, সেগুলো হচ্ছে–ফিরোজ ভালো আছে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক। তার ঘরে একটি মাইক্রোফোন বসিয়ে ঘরের যাবতীয় শব্দ টেপ করা হয়েছে। টেপগুলো তিনি সন্ধ্যাবেলা পাঠাবেন।

ফিরোজের মা চিন্তিত স্বরে বললেন, 'আপনি অসুস্থ বলেছিলেন কেন? আমরা খুব ভয়ে ভয়ে রাতটা কাটালাম। আপনার ওখানে সে কিছু করেছিল নাকি?'

'না, তেমন কিছু করে নি। একটু উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। ফিরোজ কি আছে ঘরে?'

'হ্যাঁ, আছে। কথা বলবেন?'

'বলব। দিন ওকে।'

ফিরোজের গলা শান্ত ও স্বাভাবিক।

'কেমন আছ ফিরোজ?'

'ভালো।

'কী করছিলে?'

‘কিছু করছিলাম না। একটা উপন্যাস নিয়ে বসেছিলাম।’

‘কার উপন্যাস?’

‘জন স্টেইনবেক। নাম হচ্ছে গিয়ে আপনার, সুইট থার্সডে। স্যার, আপনি পড়েছেন এটা?’

‘গল্প-উপন্যাস আমি পড়িটড়ি না। এক জন লেখকের বানানো দুঃখ-কষ্টের বিবরণ পড়ে কী হয় বল? এমনিতেই আমাদের চারদিকে প্রচুর দুঃখ-কষ্ট আছে।’

‘স্যার, আপনাকে বইটা পড়তেই হবে। আমার পড়া শেষ হলেই আপনাকে দিয়ে আসব।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। শোন ফিরোজ।’

‘বলুন।’

‘কাল রাতে তোমার কেমন ঘুম হয়েছিল?’

‘ভালো।’

‘কী রকম ভালো?’

‘খুব ভালো। এক ঘুমে রাত পার করেছি। কি জন্যে জিজ্ঞেস করছেন স্যার?’

‘এমনি জানতে চাচ্ছি। কোনো স্পেসিফিক কারণ নেই। তুমি কি কাল রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ?’

‘জ্বি-না স্যার।’

‘চট করে না বলে দিও না। চিন্তা করে তারপর বল।‘

'এবার ও সময় নিল জবাব দেয়ার আগে।'

'একটা স্বপ্ন দেখেছি। আর ওটা তো আমি প্রায়ই দেখি।'

'কোনটা?'

'ঐ যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছি, তারপর দেখি কোনো প্রশ্নের উত্তর জানি না।'

'এটা ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন দেখ নি?'

'জ্বি না।'

'শোন ফিরোজ, এ ছাড়াও যদি অন্য কোনো স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, আমাকে জানিও।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুমি কি আজ সন্ধ্যার দিকে এক বার আসবে?'

'না স্যার, আজ আসব না। বইটা শেষ করব।'

'প্রেমের উপন্যাস নাকি?'

ফিরোজ লাজুক স্বরে বলল, 'হুঁ।'

.

টেপগুলো পরীক্ষা করতে-করতে রাত তিনটা বেজে গেল। প্রথম চারটি টেপে তেমন কিছু নেই। এক বার শুধু কিছুক্ষণের জন্যে আহ্ উহ্ শব্দ। সেটা স্বপ্ন দেখার জন্যে, কিংবা বেকায়দা অবস্থায় শোয়ার জন্যে। তবে শেষ টেপটিতে মিসির আলির জন্যে বড় ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

তিনি বিচিত্র একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন সেখানে। তীক্ষ্ণ তীব্র। হাই ফ্রিকোয়েন্সি–কথাগুলো এ-রকম :

অপরিচিত কণ্ঠস্বর : 'হুঁ হুঁ ফিরোজ! ফিরোজ .... (অস্পষ্ট)

ফিরোজের কণ্ঠস্বর : 'না। না। উঁচু না।

অপরিচিত : লোহার রডটা কোথায়?

ফিরোজ : জানি না, আমি জানি না।

অপরিচিত : (অস্পষ্টভাবে কিছু বলল)। নিঃশ্বাসের শব্দ।

ফিরোজ : না। না। না।

অপরিচিত : লোহার রড। রড।

ফিরোজ : না। না।

অপরিচিত : (অস্পষ্টভাবে কিছু কথা)। হাসির শব্দ।

মিসির আলি অসংখ্যবার এই অংশটি বাজিয়ে-বাজিয়ে শুনলেন। অস্পষ্ট অংশগুলো উদ্ধার করতে পারলেন না। অপরিচিত যে-কণ্ঠস্বর শুনছেন, তা ফিরোজেরই কণ্ঠস্বর। এটি তার একটি দ্বিতীয় সত্তা। সেকেণ্ড পারসোনালিটি। ফিরোজকে পুরোপুরি সুস্থ করতে হলে তার দ্বিতীয় সত্তাটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে।

.

হানিফা ছটফট করছে। তার জ্বর কমে নি। এখন এক শ' দুইয়েরও কিছু বেশি। মিসির আলি চিন্তিত বোধ করলেন। রাত দশটার দিকে জ্বর অনেক কম ছিল। নিরানব্বুই পয়েন্ট পাঁচ। এখন এত বাড়ল কেন?

হানিফা জেগে আছে। কিন্তু কোনোরকম সাড়াশব্দ করছে না। মিসির আলি কোমল গলায় বললেন, 'খারাপ লাগছে নাকি রে বেটি?'

'না।'

'মাথার যন্ত্রণা আছে?'

'আছে।'

'বেশি?'

'মাথা টিপে দেব?'

হানিফা লজ্জিত স্বরে বলল, 'জ্বি-না।'

'না কেন? আরাম লাগবে। তার আগে মাথায় পানি ঢেলে জ্বরটা কমাতে হবে।'

তিনি বাথরুমে ঢুকলেন পানির বালতির খোঁজে। তাঁর নিজের শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। মাথা ভার ভার লাগছে। বমি-বমি লাগছে। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু একটি বাচ্চা মেয়ে জ্বরে ছটফট করবে, আর তিনি শুয়ে থাকবেন–এটা হয় না।

হানিফার এ-বাড়িতে আসার ইতিহাস বেশ বিচিত্র। গত বছর জুলাই মাসের দিকে এক বার বেশ বড় একটা ঝড় হল। রাত একটায় জেগে উঠে দেখেন, দড়ামদুড়ুম শব্দে জানালার পাট আছড়ে পড়ছে। বৃষ্টির ছাটে ঘর ভেসে যাচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। চারদিক অন্ধকার। মোটামুটি একটি ভয়াবহ অবস্থা। তিনি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলেন, আট ন' বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে একা-একা দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে।

‘কে রে তুই?’

মেয়েটি ভয়-পাওয়া স্বরে বলল, ‘আমি।’

‘এখানে কী করছিস?’

‘ঘুমাইতাছি।’

‘জেগে জেগে ঘুমাচ্ছিস নাকি?’

মেয়েটি জবাব দিল না।

‘বাপ-মা কোথায়?’

মেয়েটি নিরুত্তর।

‘তোর বাবা-মা নেই।’

‘না।’

‘আত্মীয়স্বজন কেউ নেই?’

‘না।’

‘তুই কি এ-রকম একা-একা মানুষের বারান্দায় ঘুমোস নাকি?’

‘মেয়েটি জবাব দিল না। মিসির আলি বললেন, ‘ভয় লাগছে না তোর?’

‘না।’

‘বলিস কী! নাম কি তোর?’

‘হানিফা।’

‘আয়, ভেতরে আয়। ইস্, ভিজে জবজবে হয়ে গেছিস তো!’

‘মিসির আলি হারিকেন জ্বালিয়ে তাকালেন মেয়েটির দিকে। ছেলেদের মতো ছোট-ছোট করে কাটা চুল। আদুরে একটা মুখ।

‘তোর বাপের নাম কি?’

‘জানি না।’

‘বলিস কী! মা’র নাম?’

‘জানি না।’

‘তোর হাতে কী? মুঠোর ভেতর কী আছে?’

হানিফা মুঠি খুলল। ভাংতি পয়সা।

‘ভিক্ষা করে পেয়েছিস?’

‘হুঁ।’

মিসির আলি গুনলেন। দু’ টাকা ত্রিশ পয়সা। এই বিশাল পৃথিবীতে আগামীকাল এই মেয়েটি যাত্রা শুরু করবে–দু’ টাকা ত্রিশ পয়সা, একটা নোংরা ফ্রক এবং একটা তালি দেয়া প্যান্ট নিয়ে। কোনো মানে হয়? তিনি একটি শুকনো লুঙ্গি বের করলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, ‘কাপড় বদলে এটা পরে ফেল্। নিউমোনিয়া বাধাবি তো! ঐ ঘরে একটা বিছানা আছে, ওখানে গিয়ে শুয়ে থাক্।

মিসির আলি ভেবেছিলেন, সকাল হলেই সে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। এক বার যাযাবর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে বন্ধন আর ভালো লাগে না। কিন্তু হানিফা সকালবেলা চলে যাবার কোনো রকম লক্ষণ দেখাল না। এমনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যেন এইটি তার ঘরবাড়ি।

.

হানিফার প্রতি সমাজের যে দায়িত্ব ছিল, মিসির আলি তা পালন করেছেন। নিজেই তাকে পড়তে শিখেয়েছেন। যোগ ভাগ গুণ শিখিয়ে নিয়ে গেছেন স্কুলে ভর্তি করাবার জন্যে। কেউ ভর্তি করাতে রাজি হয় নি। এত বড় মেয়েকে ক্লাস ওয়ানে অ্যাডমিশন দেয়ানো সম্ভব নয়। তিনি হানিফাকে বলেছেন, 'ঠিক আছে, তুই ঘরে বসেই পড়াশোনা চালিয়ে যা। যথাসময়ে প্রাইভেটে তোকে দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়াব। আমি নিজে তো সব সময় দেখতে পারি না। এক জন মাস্টার রেখে দেব।'

.

শেষরাতের দিকে হানিফার জ্বর কমে এল। শরীর ঘামতে লাগল। সে বিড়বিড় করে নানান কথা বলতে লাগল। মেয়েটির বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো থেকেই মিসির আলি বড় ধরনের একটি আবিষ্কার করলেন। তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

এই প্রসঙ্গে যথাসময়ে বলা হবে।

৪

সাইকোলজি বিভাগের সভাপতি ডঃ সাইদুর রহমানের মেজাজ সকাল থেকেই খারাপ। মেজাজ খারাপের প্রধান দুটি কারণের একটি হচ্ছে– সুইডেনে একটি কনফারেন্সে তাঁর যাবার খুব শখ ছিল, কিন্তু আমন্ত্রণ আসে নি। তিনি চেষ্টা তদবিরের তেমন কোনো ত্রুটি করেন নি। যেখানে একটা চিঠি দেয়া দরকার, সেখানে তিনটি চিঠি দিয়েছেন। প্রফেসর নোয়েল বার্গকে বাংলাদেশের হস্তশিল্পের নমুনা হিসাবে একটি চটের ব্যাগ পাঠিয়েছেন, যেটা কিনতে তাঁর তিন শ' টাকা লেগেছে। রাজশাহীতে তৈরি খুব ফ্যান্সি ধরনের ব্যাগ। প্রফেসর নোয়েল বার্গ একটি চিঠিতে ব্যাগের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু বহু প্রতীক্ষিত নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠান নি। সাইদুর রহমান সাহেবের মেজাজ খারাপের দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে–মিসির আলি-সংক্রান্ত সমস্যা। মিসির আলি লোকটিকে তিনি মনেপ্রাণে অপছন্দ করেন। পার্টটাইম টীচার হিসেবে মিসির আলির অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিপক্ষে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লাভ হয় নি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেব বলেছেন, কোনো পোস্ট অ্যাডভারটাইজ হওয়ামাত্র তাঁকে নেয়া হবে। সাইদুর রহমান সাহেব গত দু' বছরে কোনো পোস্ট অ্যাডভারটাইজড হতে দেন নি। এডহক ভিত্তিতে এক জনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন।

তাঁর ধারণা ছিল এডহক অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে মিসির আলি হৈচৈ করবেন। কিন্তু মিসির আলি কিছুই করেন নি। এটাও একটা রহস্য। এই

লোকটির কি জীবনে উন্নতি করবার কোনোরকম ইচ্ছা নেই, না তার সবটাই ভান?

মিসির আলির ওপর আজ ভোরবেলায় তাঁর রাগ চরমে উঠেছে। কারণ তিনি দেখেছেন, সুইডেন থেকে মিসির আলির নামে একটি খাম এসেছে। তাঁর ধারণা, এটা কনফারেন্সের নিমন্ত্রণপত্র। কারণ, প্রেরকের নামের জায়গায় প্রফেসর নোয়েল বার্গের নাম আছে। প্রফেসর নোয়েল বার্গ হচ্ছেন কনফারেন্সের আহ্বায়ক।

সাইদুর রহমান সাহেব অফিসে খোঁজ নিলেন–মিসির আলি এসেছেন কি না। জানা গেল, তিনি এসেছেন। কাজেই সুইডেনের সেই খাম নিশ্চয়ই খোলা হয়েছে। সাইদুর রহমান সাহেব হেড ক্লার্ককে বললেন, 'মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাহলে বলবেন, আমি খোঁজ করছিলাম।

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'তাঁকে তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। ডিপার্টমেন্টে আসেন না নাকি?'

'ক্লাস না থাকলে আসেন না।'

'গতকাল এসেছিলেন?'

'জ্বি, গতকাল এসেছিলেন। এক জন ছাত্রীর ঠিকানা খুঁজে বের করবার জন্যে খুব হৈচৈ করলেন।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার। নীলুফার ইয়াসমিন। সে দেড় বছর ধরে ইউনিভার্সিটিতে আসে না, এখন তার ঠিকানা খোঁজার জন্যে যদি অফিসের সব কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হয়, তাহলে তো মুশকিল।'

'কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হবে কেন? এ-সব পার্সোনাল কাজের জন্যে তো অফিস না। আপনি স্ট্রেইট বলে দেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'তা ছাড়া এক জন টীচার ছাত্রীর ঠিকানার জন্যে ব্যস্ত হবে কেন? এ-সব ঠিক না। নানান রকমের কথা উঠতে পারে।'

.

মিসির আলি ভেবেই পেলেন না, ইউনিভার্সিটির এক জন ছাত্রীর ঠিকানা বের করা এত সমস্যা হবে কেন? অফিসে নেই। অফিস থেকে বলা হল, সমস্ত রেকর্ডপত্র ডীন অফিসে। ডীন অফিসে গিয়ে জানলেন, রেকর্ডপত্র আছে রেজিস্ট্রার অফিসে। রেজিস্ট্রার অফিসে যে কেরানি এসব ডীল করে, দু' ঘন্টা অপেক্ষা করেও তার দেখা পাওয়া গেল না। সকালবেলা সে নাকি এসেছিল। চা খেতে গিয়েছে। মিসির আলি রেজিস্ট্রার অফিসের ক্যান্টিনেও খুঁজে এলেন। দেখা পাওয়া গেল না। আবার আসতে হবে আগামীকাল। ডিপার্টমেন্টে ফিরে এসে শুনলেন–সাইদুর রহমান সাহেব তাঁকে খোঁজ করেছেন। মিসির আলি বিস্মিত হলেন। সাইদুর রহমান সাহেব তাঁকে পছন্দ করেন না। বড় রকমের প্রয়োজনেও তাঁর খোঁজ করেন না। আজ করছেন কেন?

‘স্লামালিকুম স্যার।’

‘ওয়ালাইকুম সালাম।’

‘আপনি কি আমার খোঁজ করছিলেন?’

‘বসুন মিসির আলি সাহেব। আছেন কেমন?’

‘ভালো।’

মিসির আলি বসলেন।

‘কি জন্যে ডেকেছিলেন?

‘তেমন কিছু না।’

সাইদুর রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সুইডেনের চিঠির প্রসঙ্গ তুলবেন কি না বুঝতে পারলেন না। তুললেও এমনভাবে তুলতে হবে, যাতে এই লোক বুঝতে না পারে, তিনি এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী।

মিসির আলি বললেন, ‘স্যার, আপনি কি কিছু বলবেন?’

‘তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু না। সুইডেনের কনফারেন্সের খবর কিছু জানেন? মানে আমার যাবার কথা ছিল। পেপারের অ্যাবস্ট্রাক্ট পাঠিয়েছিলাম প্রফেসর নোয়েলের কাছে।’

মিসির আলি সহজ গলায় বললেন, ‘আমি ওদের ইনভাইটেশন পেয়েছি। পেপার দেবার জন্যে বলছে।’

‘তাই নাকি?’

সাইদুর রহমান সাহেব নিভে গেলেন। টেনে-টেনে বললেন, ‘যাচ্ছেন কবে নাগাদ এক সপ্তাহের ভেতরই তো রওনা হওয়া উচিত?’

'আমি যাচ্ছি না স্যার।'

'কেন?'

'আমার কাজের মেয়েটি অসুস্থ।'

সাইদুর রহমান সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কাজের মেয়ে অসুস্থ, এই জন্যে সে সুইডেন যাবে না। বদ্ধ উন্মাদ নাকি!

'কাজের মেয়ে অসুস্থ, সেই কারণে যাচ্ছেন না?'

'ওটা একটা কারণ। তা ছাড়া অন্য একটি কারণ আছে।'

'জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারেন। আমি এক জন রোগীর মনোবিশ্লেষণ করছি। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'সত্যি বলছেন?'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, 'মিথ্যা বলব কেন?'

'আপনি কি আপনার ডিসিসন ওদেরকে জানিয়েছেন?'

'আজই তো মাত্র চিঠি পেলাম।'

'তবু আপনার উচিত ইমিডিয়েটলি আপনার ডিসিসন ওদের জানানো। হয়তো ওদের কোনো অলটারনেট ক্যানডিডেট আছে।'

'স্যার, আপনার কি সেখানে যাবার ইচ্ছা? ইচ্ছা থাকলে বলেন।'

'বলব মানে, আপনি কী করবেন?

'নোয়েল আমার বন্ধুমানুষ। ইংল্যাণ্ডে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমার তিনটা পেপার আছে, যেখানে নোয়েল হচ্ছে এক জন কো-অথর। আপনার বোধহয় চোখে পড়ে নি।'

সাইদুর রহমান সাহেবের মুখ তেতো হয়ে গেল। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, 'সুইডেন কি একটা যাওয়ার মতো জায়গা? আছে কি সেখানে, বলুন? দেখার কিছু আছে? কিছুই নেই। একটা ফালতু জায়গা।'

'দেখাদেখিটা তো ইম্পর্টেন্ট নয়। সেমিনারটাই প্রধান। সারা পৃথিবী থেকে জ্ঞানীগুণীরা আসবেন।

'ঐসব কচকচানি শুনে কোনো লাভ হয়? কোনোই লাভ হয় না। শুধু বড়-বড় কথা।'

'এটা ঠিক বললেন না। সেখানে যাঁরা আসবেন, তাঁরা কথার চেয়ে কাজ অনেক বেশি করেন। বিশেষ করে এমন কিছু লোকজন আসবেন, যাঁদের দেখলে পুণ্য হয়।'

'আপনিও তো ওদের নিমন্ত্রিত, তার মানে বলতে চাচ্ছেন, আপনাকে দেখলেও পুণ্য হবে?'

মিসির আলি একটু হকচকিয়ে গেলেন। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা হবে। আপনি অনেকক্ষণ আমাকে দেখলেন। অনেক পুণ্য করলেন। উঠি স্যার?'

ডঃ সাইদুর রহমান বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। মনে-মনে এমন কিছু গালাগালি দিলেন, যা তাঁর মতো অবস্থার ব্যক্তিরা কখনো দিতে পারে না। এর মধ্যে একটি গালি ভয়াবহ।

৫

বছরখানেক হল নীলুর বাবা জাহিদ সাহেবের স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙতে শুরু করেছে। এমন কিছু অসুখ তাঁকে ধরেছে, যা শুধু কষ্টকর নয়, অত্যন্ত বিরক্তিকর। কিছুই হজম হয় না। পানি মেশান দুধ, লেবুর রস দিয়ে বার্লি, এক স্লাইস রুটি বা শিং মাছের মশলাবিহীন ঝোল–কিছুই না। ডাক্তার প্রায় সবই দেখানো হয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন, লিভার কাজ করছে না। ডাক্তারদের শুকনো ধরনের কথাবার্তা, ইতস্তত ভাবভঙ্গি থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে–অসুখটা জটিল। হয়তো-বা লিভার ক্যানসার-ট্যানসার বাধিয়ে বসেছেন। ডাক্তাররা সরাসরি তাঁকে কিছু বলেন না। তিনিও জিজ্ঞাসা করতে ঠিক সাহস পান না। নীলুর সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তেমন কোনো কথাবার্তা বলে না। তিনি কিছু একটা বলতে শুরু করলে মন দিয়ে শোনে, কিন্তু কথার মাঝখানে এমন একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে বসে যে, তাঁর ধারণা হয় নীলু আসলে কিছু শুনছে না। শুধু তাকিয়েই আছে।

নীলুকে ইদানীং তিনি ভয় করেন। যে-নীলু তাঁর সঙ্গে থাকে, তাকে তাঁর নিজের মেয়ে বলে কখনো মনে হয় না। এ যেন একটি অচেনা মেয়ে যাকে কোনোদিনই ঠিক চেনা যাবে না।

অবশ্যি নীলু তাঁর সঙ্গে একেবারেই যে কথাবার্তা বলে না, তা নয়। কথাবার্তা বলে। এসে জিজ্ঞেস করে, 'চা লাগবে বাবা?' এই পর্যন্তই। তিনি যদি বলেন লাগবে, তাহলে সে উঠে গিয়ে চা বানিয়ে কাজের ছেলেটির হাতে পাঠিয়ে দেবে। যদি বলেন লাগবে না, তাহলে চুপ করে যাবে। দ্বিতীয় কোনো কথা বলবে না।

জাহিদ সাহেব আজকাল তাঁর দ্বিতীয় মেয়েটির অভাব খুব অনুভব করেন। সে পাশে থাকলে বাসার অবস্থা হয়তো আরেকটু স্বাভাবিক হত। বিলুর বিয়েটা তিনি ভালো দিতে পারেন নি। অথচ তখন মনে হয়েছিল, কী চমৎকার একটি ছেলে। তিনি বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি দেশে চলে আসবে তো বাবা? বিদেশে সে করবে না তো? আমি আমার মেয়েকে দেশান্তরী করতে চাই না। আমি একা মানুষ, আমি চাই আমার দুটি মেয়ে আমার আশেপাশেই থাকবে।'

বিলুর বর হাসিমুখে বলেছে, 'বিদেশে সে করব কেন? কী আছে ওখানে? মানুষ হিসেবে কোনো দাম আছে আমাদের? আমি বছরখানেক থাকব। কিছু টাকাপয়সা জমিয়ে দেশে ফিরব। মাথা গুঁজবার মতো একটা বাড়ি তো কিনতে হবে!'

জাহিদ সাহেব ছেলের কথা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু এখন জানতে পেরেছেন, সে মনটানাতে একটা বাড়ি কিনেছে। যে-ছেলে দেশে চলে আসবে, সে নিশ্চয় বিদেশে বাড়ি কেনে না। তা ছাড়া, বিলু সুখী হয় নি বলে তাঁর ধারণা। বিলুর চিঠিপত্রে অবশ্য কিছু লেখা থাকে না। কিন্তু চিঠিগুলো প্রাণহীন। যেন লেখার জন্যেই লেখা। দায়িত্ব পালনের চিঠি। এক জন সুখী মেয়ের চিঠিতে থাকবে আনন্দের ছবি। সে তার বরের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখবে। খুটিনাটি বিষয় নিয়ে উচ্ছ্বাস থাকবে। সে-সব কিছু থাকে না। বাবা হিসেবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। সৎপাত্রে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারেন নি। অথচ ছেলেটিকে সত্যি সত্যি তাঁর পছন্দ হয়েছিল। ভদ্র ছেলে। চমৎকার কথাবার্তা। দারুণ শার্প। সেই সঙ্গে রসিক। খাওয়ার টেবিলে একবার সে এক গল্প শুরু করল। এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে এক ভণ্ড তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছে। হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে তর্কযুদ্ধ দেখতে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মঞ্চে বসে আছেন–ভণ্ড পণ্ডিত ঢুকল এবং গম্ভীর হয়ে বলল–'ফুন ফুনাফুন?' দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি তাঁর সারাজীবনে–'ফুন ফুনাফুন' বলে কিছু শোনেন নি। এর মানে কী, তা তাঁর জানা নেই।

ভারি মজার গল্প। জাহিদ সাহেব গল্প শুনে হাসতে হাসতে বিষম খেলেন। নীলুর মতো গম্ভীর মেয়েও হেসে ফেলল। এই কি সেই ছেলে?

জাহিদ সাহেব আজকাল বেশির ভাগ সময়ই বারান্দায় বসে এইসব কথা ভেবে ভেবে কাটান। দু'-তিনটে পত্রিকা তাঁর হাতের কাছে থাকে, সে-সব

পড়া হয় না। পনের খণ্ড মুক্তিযুদ্ধের দলিল কিনেছেন। শখ ছিল গোড়া থেকে পড়বেন, তা পড়তে পারছেন না। ইচ্ছা করে না। মাঝে-মাঝে শুধু অষ্টম খণ্ডে চোখ বুলিয়ে যান। অষ্টম খণ্ড হচ্ছে অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী। পড়তে-পড়তে তাঁর বুক হুহু করে।

আজও তাই করছিলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন, নীলু তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নীলু নিঃশব্দে চলাফেরা করে। হঠাৎ উপস্থিত হয়ে চমকে দেয়।

জাহিদ সাহেব বললেন, 'কি খবর মা?'

'কোনো খবর নেই বাবা।'

'কোথাও বেরুচ্ছিস?'

'না।'

নীলু বসল তাঁর পাশের চেয়ারে। তিনি লক্ষ করলেন, নীলু বেশ সাজগোজ করেছে। কপালে টিপ। সুন্দর একটি শাড়ি। খোঁপায় ফুল পর্যন্ত দিয়েছে।

জাহিদ সাহেব বললেন, 'তোর স্যার তো আর এলেন না।'

'উনি এসেছিলেন। বাড়ি চিনতে পারেন নি। রিকশা করে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে দু' বার গেলেন।'

'তুই দেখছিস?'

নীলু কিছু বলল না। সে দেখে নি। না দেখেই বলেছে। খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু জাহিদ সাহেব জানেন, অস্বাভাবিক হলেও এটা সত্যি। নীলু না-দেখেই অনেক কিছু বলতে পারে। কেমন করে পারে, তা তিনি জানেন না। জানতে চানও না। নীলুর এই অস্বাভাবিক ক্ষমতাকে তিনি ভয় করেন।

কোনোদিন ভোরবেলায় নীলু এসে যদি বলে, 'বাবা, আজ তোমার দিনটি ভালো যাবে। আজ বিলুর চিঠি পাবে।'

তিনি হাসতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হাসি ঠিক আসে না।

'চিঠির সঙ্গে ছবিও পাবে। সুন্দর-সুন্দর ছবি পাঠিয়েছে বিলু।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'নীলু হাসে। এই নীলু আগের নীলু নয়। এই নীলুকে তিনি চেনেন না।

জাহিদ সাহেব বললেন, 'তোর স্যার এসেছিলেন, তাঁকে ডেকে ঘরে আনলি না কেন?'

'উনি নিজেই খুঁজে বের করবেন। আমাদের এই স্যার কোনো জিনিসই মাঝপথে ছেড়ে দেন না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। খুব মেথডিকেল মানুষ। তোমার সঙ্গে তো বাবা ওঁর সাথে এক বার দেখা হয়েছিল।'

'আমার মনে নেই।'

নীলু হাসতে-হাসতে বলল, 'স্যারটা খুব আনইমপ্রেসিভ। তাঁর কথা মনে না থাকারই কথা।'

জাহিদ সাহেব নীলুর গলায় এক ধরনের আবেগ অনুভব করলেন। এই আবেগের কারণ কী? তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললেন, 'খুব গরম পড়েছে এ-বছর।'

নীলু বলল, ‘প্রতি বছর গরমের সময় তুমি এই কথাটা বল। আবার শীতের সময় বল–এ বছর মারাত্মক শীত পড়েছে। বল না বাবা?’

‘বলি বোধহয়।’

‘আমরা বেঁচে থাকি বর্তমানকে নিয়ে। অতীতের কথা আমাদের কিছু মনে থাকে না।’

কথাটা কি ঠিক? না, ঠিক নয়। কিছু-কিছু অতীত তার কালো সীল শক্ত করে বসিয়ে দেয়, কিছুতেই তা তুলে ফেলা যায় ন। নীলুর বিয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি প্রথম তা লক্ষ করলেন। যে-কোনো আলাপ অল্প কিছুদূর এগোনর পরই বরপক্ষের লোকজন জানতে পেরে যায়, তাঁর এই মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল একটি বাড়িতে। যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে এক জন ভয়াবহ খুনী। কিন্তু কাউকেই তিনি বিশ্বাস করাতে পারেন নি যে, সেই খুনী নীলুকে স্পর্শ করতে পারে নি। কোনো-এক রহস্যময় কারণে তার মৃত্যু হয়েছিল। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে ডাক্তার অবশ্যি লিখেছিল– মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যু, কিন্তু জাহিদ সাহেব তা বিশ্বাস করেন না। তিনি জানেন মৃত্যুর কারণ অমীমাংসিত এবং রহস্যময়।

সেই রহস্য তাঁর মেয়েকে এখনো ঘিরে আছে। তিনি তা চান না। তিনি তাঁর মেয়ের জন্যে একটি সহজ স্বাভাবিক জীবন চান। একটি ছোট্ট সুখী সংসার। দুটি শিশু—-তিনি যাদের হাত ধরে পার্কে বেড়াতে যাবেন। বাদাম কিনে দেবেন। এক জন হঠাৎ পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবে। তিনি কোলে নিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করবেন। তাই দেখে অন্যজনের হিংসা হবে। তাকেও

কোলে নিতে হবে। কেউ তখন আর কোল থেকে নামতে চাইবে না। বড় ঝামেলায় পড়ে যাবেন তিনি।

তাঁর চিন্তায় বাধা পড়ল। নীলু হেসে উঠল খিলখিল করে। পুরনো দিনের নীলুর মতো। জাহিদ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'হাসছিস কেন?'

'তুমি কী অদ্ভুত সব কল্পনা কর বাবা।'

নীলু হাসতে হাসতে উঠে চলে গেল। জাহিদ সাহেব স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এ কোন নীলু? এই ভয়ঙ্কর ক্ষমতার উৎস কী?

৬

মিসির আলি হানিফাকে পিজিতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, মেয়েটি একা-একা থাকতে ভয় পাবে। কিন্তু হানিফা ভয় পেল না।

'থাকতে পারবি তো?'

'হুঁ।'

'অনেক রকম পরীক্ষা-টরীক্ষা করবে ডাক্তাররা। ভয়ের কিছু নেই।'

'আমি ভয় পাই না।'

তিনি ভেবে দেখলেন, মেয়েটির ভয় না পাওয়ারই কথা। যে জীবন শুরু করেছে রাস্তায়, তার আবার ভয় কিসের?

'হানিফা।'

'জ্বি?'

‘আমি দু’ দিনের জন্যে ঢাকার বাইরে যাব। মোহনগঞ্জ যাব। তুই থাকতে পারবি তো?’

‘পারব।’

‘দু’ দিন পরই এসে পড়ব। এর মধ্যে ডাক্তাররা পরীক্ষা-টরীক্ষা যা করবার করবেন। তা ছাড়া আমি আমাদের বাড়িওয়ালাকে বলে যাব, তিনি খোঁজখবর করবেন।

‘খোঁজখবরের দরকার নাই।’

‘দরকার থাকবে না কেন? দরকার আছে। যাই তাহলে, কেমন?

‘জ্বি আচ্ছা।’

মিশির আলি বিমর্ষ মুখে বের হয়ে এলেন। মেয়েটির অসুখ তাঁকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন ডাক্তারের পরামর্শে। ডাক্তারের ধারণা, হার্টসংক্রান্ত কোনো সমস্যা। ইসিজি টিসিজি করাতে হবে। হার্ট-বিট খুবই নাকি ইরেগুলার।

তাঁর ট্রেন রাত ন’টায়। তিনি ঠিক করলেন, রওনা হবার আগে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে যাবেন। পুলিশ কমিশনার সাজ্জাদ হোসেন তাঁর কলেজজীবনের বন্ধু। খুব-একটা পরিচয় তখন ছিল না। এখন হয়তো চিনতেই পারবে না। তবু পুরানো পরিচয়ের সূত্র টানা যেতে পারে—গরজটা যখন তাঁর।

সাজ্জাদ হোসেন তাঁকে চিনলেন। শুধু যে চিনলেন তাই নয়, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরে একটা কাণ্ড করলেন। পুলিশের লোকদের

মধ্যে এতটা আবেগ থাকে, তা মিসির আলি ভাবেন নি। তাঁর ধারণা ছিল, দিন-রাত ক্রাইম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে এরা আবেগশূন্য হয়ে পড়ে। সেটাই স্বাভাবিক।

সাজ্জাদ হোসেন বললেন, 'ফ্যানটার নিচে আগে আরাম করে বস্, তারপর বল কী দরকারে এসেছিস। পুলিশের কাছে কেউ বিনা প্রয়োজনে আসে না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। পুলিশ এবং ডাক্তার–এই দু'ধরনের মানুষের কাছে কেউ বিনা প্রয়োজনে যায় না। এখন তুই বল, কী ব্যাপার? আত্মীয়স্বজন কাউকে পুলিশে ধরেছে?'

'না, সে-সব কিছু না।'

'নে, সিগারেট নে। নিশ্চিন্তে খা। ঘুষের পয়সায় কেনা নয়। নিজের কষ্টে উপার্জিত রোজগার থেকে কেনা। হা হা হা!'

মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। সাজ্জাদ বললেন, 'বিয়েটিয়ে করেছিস?'

'না।'

'জানতাম করবি না। তুই হচ্ছিস একটা অড-বল। আমি বিয়ের পাট চুকিয়েছি আট বছর আগে। বাচ্চা-কাচ্চা কিছু হয় নি। হবেও না।

সাজ্জাদ হোসেনের চোখে-মুখে ক্ষণিকের জন্য একটা ছায়া পড়ল। কিন্তু তিনি তা নিমিষেই কাটিয়ে উঠলেন। হাসিমুখে বললেন, 'জেসমিন চৌধুরী।'

মিসির আলি চিনতে পারলেন না। সাজ্জাদ হোসেন অবাক হয়ে বললেন, ‘সত্যি চিনতে পারছিস না? ও তো টিভিতে অভিনয় করে। মারাত্মক। তাকে কেউ চেনে না, এটা তো আমি ভাবতেই পারি না!’

‘টিভি নেই আমার বাসায়।

‘বলিস কী! বাসায় খাট-পালঙ্ক আছে তো? নাকি মেঝেতে পাটি পেতে ঘুমাস? হা হা হা। এখন বল তোর সমস্যা।’

‘আমার একটি কাজের মেয়ে আছে–হানিফা।’

‘জিনিসপত্র নিয়ে ভেগে গেছে?’

‘না, তা না। আমি এই মেয়েটির অতীত ইতিহাস খুঁজে বের করতে চাই। সেটা কীভাবে করা সম্ভব, তাই জানার জন্যে তোর কাছে আসা।’

‘পাস্ট হিস্ট্রি জানতে চাস কেন?’

‘মেয়েটি জানে না, তার বাবা-মা কে। আত্মীয়স্বজন কে কোথায়, তাও বলতে পারে না। জ্ঞান হবার পর থেকেই সে দেখেছে যে, সে ভাসছে। আমি ওর বাবা-মাকে ট্রেস করতে চাই।’

সাজ্জাদ হোসেন গম্ভীর স্বরে বললেন, ‘খামোকা চেষ্টা করছিস। কিছুই ট্রেস করা যাবে না। সম্ভবত জন্ম হয়েছে বেশ্যাপল্লীতে। তারপর হারিয়ে গেছে সেখান থেকে।’

‘আমার তা মনে হয় না।’

‘কেন মনে হয় না?’

মিসির আলি তার জবাব না দিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় মেয়েটির শৈশব কেটেছে বিদেশে।'

'চোখ নীল? ব্লন্ড চুল?'

'না। মেয়েটি বাঙালিই, কিন্তু বাবা-মা হয়তো বিদেশে ছিলেন।'

'কেন বলছিস এ সব? তোর লজিক কী?'

মিসির আলি আরেকটা সিগারেট ধরালেন। এবং থেমে থেমে বললেন, 'হানিফা মেয়েটি গত পরশু রাতে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড জ্বর। জ্বরের ঘোরে সে বিড়বিড় করে বলছিল–'ইট হার্টস,ইট হার্টস।

সাজ্জাদ হোসেন তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। মিসির আলি বলে চললেন, 'আমার মনে হয়, খুব ছোটবেলায় মেয়েটি যখন অসুস্থ ছিল, তখন সে তার মাকে বলত—মামি ইট হার্টস। পরশু রাতে প্রচণ্ড জ্বরের মুখে অতীতের চাপা-পড়া কথাগুলো বের হয়ে এসেছে। অবচেতন মন সেই সময় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ-জাতীয় ব্যাপারগুলো ঘটে।'

সাজ্জাদ হোসেন শুধু বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং!'

মিসির আলি বললেন, 'হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বাবা-মা নিশ্চয়ই থানায় ডায়েরি করান। সেখান থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না? ধর্, আমি যদি জানতে চাই, পাঁচ থেকে আট বছর আগে কোন কোন বাচ্চা নিখোঁজ হয়েছিল জানা যাবে কি?'

'না, এত পুরনো রেকর্ডপত্র কে বের করবে, বল্? এটা তো ইংল্যাণ্ড আমেরিকা না যে, সব কম্পিউটারে ঢোকানো আছে, বোতাম টিপলেই বেরিয়ে আসবে।'

'পুরনো রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা নেই?'

'নতুন রেকর্ড রাখারই জায়গা নেই, আর পুরনো রেকর্ড! একটা মিসিং পার্সন ব্যুরো আছে, সেখানে কোনো কাজ হয় না। তা ছাড়া সেন্ট্রালি ইনফরমেশন রাখার কোনো ব্যবস্থা আছে বলে আমার মনে হয় না। প্রতিটি থানায়ও আলাদা-আলাদাভাবে খোঁজ করতে হবে। সেটা একটা বিশাল ব্যাপার।'

'বিশাল হলেও নিশ্চয়ই অসম্ভব না?'

'কিছুটা অসম্ভবও।'

'তোর পক্ষে কিছু করা সম্ভব না?'

সাজ্জাদ হোসেন গম্ভীর হয়ে রইলেন। মিসির আলি বললেন, 'আমি নিজে সমস্ত পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারি।'

'সেটা মন্দ না, গুড আইডিয়া।'

'না, আইডিয়াটা খুব গুড নয়।'

'নয় কেন?'

'অন্য এক সময় বলব, কেন নয়। আজ উঠতে হবে। ময়মনসিংহ যাচ্ছি একটা জরুরি কাজে। ফিরে এসে তোর সাথে যোগাযোগ করব।

মিসির আলি উঠে পড়লেন।

৭

ফিরোজরা ধানমণ্ডির যে বাড়িটিতে থাকে, তাকে বাড়ি না বলে রাজপ্রাসাদ বলা যেতে পারে। বিশাল একটি দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারপাশে জেলের মত উঁচু পাঁচিল। গেটে বড় বড় করে লেখা 'কুকুর হইতে সাবধান'। গেটটি চব্বিশ ঘন্টাই বন্ধ থাকে। বন্ধ গেট ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ, দারোয়ান এক জন আছে, যে প্রায় কখনোই গেটের কাছে থাকে না। আর থাকলেও ভান করে যে, কলিং বেলের শব্দ শুনতে পায় নি।

পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই বিশাল বাড়িগুলো জনশূন্য হয়ে থাকে। এ বাড়িতেও তাই। তিনটি প্রাণী এ-বাড়িতে বাস করে। ফিরোজ এবং তার বাবা ও মা। বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে দশজনের একটা বাহিনী আছে। তবে রাতে তারা এ বাড়িতে ঘুমায় না। বাড়ির পেছনেই হোস্টেল ঘরের মতো চার-পাঁচটা রুমের একটা টিনের হাফ-বিল্ডিং আছে। এরা রাতে সেখানে থাকে। মূল বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা হচ্ছে কলিং বেল। রাতের বেলায় প্রয়োজন হলে কলিং বেল টিপে এদের ডাকা হয়। সে-প্রয়োজন সাধারণত হয় না।

ফিরোজের অসুখের পর অবস্থা খানিকটা বদলেছে। তার ঘরের সামনের বারান্দায় রহমতের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কাদেরের মাকেও মূল বাড়ির একতলায় থাকতে দেয়া হয়েছে। তবে এ-ব্যবস্থা সাময়িক।

ফিরোজের বাবা ওসমান সাহেবের বয়স প্রায় ষাট। ফিরোজ তাঁর তিন নম্বর ছেলে। ফিরোজের আগে দু'টি ছেলে যথাক্রমে ন'বছর এবং এগার বছর বয়সে মারা যায়। দু'টি মৃত্যুই অস্বাভাবিক। বড় ছেলে মারা যায় পিকনিক করতে গিয়ে। ইস্কুলের সব ছেলেরা দল বেঁধে গিয়েছিল সালনায়। পিকনিক শেষ করে সবাই ফিরে এল, কেউ লক্ষই করল না, একটি ছেলে কম। সালনার পুকুরে সে ভেসে উঠেছিল।

ওসমান সাহেবের মধ্যম ছেলেটি মারা গেছে রোড অ্যাক্সিডেন্টে। সে রাস্তা পার হবার সময় আচমকা দৌড় দেয় নি বা হঠাৎ কোনো ট্রাকের সামনে গিয়ে পড়ে নি। সে হাঁটছিল ফুটপাত ধরেই। কিন্তু সিমেন্টের বস্তা বোঝাই একটি ট্রাক সেই ছুটির দিনের সকালে ফুটপাতে উঠে গিয়েছিল।

যে-পরিবারের দু'টি ছেলে অপঘাতে মারা যায়, সেই পরিবারের বাবা-মা সাধারণত ভেঙে পড়েন। এই পরিবারটির ক্ষেত্রে সে-রকম কিছু ঘটে নি। ওসমান সাহেব অত্যন্ত শক্ত ধরনের মানুষ। কোনো কারণে বিচলিত হওয়া তাঁর স্বভাবের মধ্যেই নেই। তাঁর স্ত্রী ফরিদা স্বামীর এই গুণ কিছু পরিমাণে পেয়েছেন। বড় বড় ঝড়-ঝাপটাতে মোটামুটি স্থির থাকতে পারেন। ফিরোজের ভয়াবহ বিপর্যয়েও তাঁরা স্বামী-স্ত্রী স্থির ছিলেন। ধৈর্য হারান নি। ফরিদা এক বার শুধু বলেছিলেন, 'আমাদের ওপর কারোর অভিশাপ আছে।' আর তাতেই ওসমান সাহেব এমন ভঙ্গিতে তাকিয়েছিলেন যে, তিনি দ্বিতীয় বার এ-জাতীয় কথা বলেন নি। স্বামীকে তিনি বেশ ভয় পান। তাঁর ইচ্ছা ছিল ফিরোজকে চিকিৎসার জন্যে বিদেশে নিয়ে যান। তাও

সম্ভব হয় নি। ওসমান সাহেবের জন্যে। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমি আমার বদ্ধ উন্মাদ ছেলেকে বিদেশে নিয়ে যাব না। কিছুটা সুস্থ হোক, তারপর নিয়ে যাব।'

ফরিদা বলেছিলেন, 'চিকিৎসা যে করছে, সে তো ডাক্তার না। এক জন ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাও। ভদ্রলোক মাস্টার মানুষ, উনি কী চিকিৎসা করবেন?

'যদি কেউ কিছু করতে পারে, উনিই পারবেন। ধৈর্য ধর।'

তিনি ধৈর্য ধরলেন। ধৈর্য ধরা বিফলে যায় নি। ফিরোজ এখন সুস্থ। ভয়াবহ একটা স্তর সে পার হয়েছে। ওসমান সাহেবের ধারণা, ফিরোজ এখন পুরোপুরি ভালো। সহজ-স্বাভাবিক মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো পড়াশোনা শুরু করবে। এখন তাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া যায়। পাহাড়ের ওপরে কোনো ঠাণ্ডা জায়গায়। হাতের কাছেই আছে নেপাল। প্লেনে যেতে তেতাল্লিশ মিনিট লাগে। ওসমান সাহেব ঠিক মনস্থির করতে পারছেন না। এখনো হয়তো ফিরোজকে নিয়ে বাইরে বেরুবার মতো অবস্থা হয় নি। মিসির আলি সে রকমই বলেছেন। মিসির আলির মতের সঙ্গে তিনি একমত নন। তবু তাঁকে অগ্রাহ্য করার সাহস হয় না। হয়তো আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণে বর্ষা শুরু হবে। তিনি শুনেছেন, বর্ষায় নেপাল দর্শনীয় নয়। দিনরাত টিপটিপ করে বৃষ্টি। হোটেলের ঘরেই বন্দি জীবন-যাপন করতে হবে।

ওসমান সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। এটা একটা নতুন ব্যাপার। তাঁর জীবনে ধৈর্যের অভাব কোনোদিন ছিল না। তিনি সমস্ত জটিলতাকে সহজভাবে গ্রহণ করেন। এখন কি তা পারছেন না? ওসমান সাহেব চুরুট ধরিয়ে ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'ফরিদা, ফরিদা।'

ফরিদা পাশের ঘরেই ছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকলেন।

'ফিরোজ কেমন আছে আজ?'

'ভালো।'

'কি করছে?'

'ভেতরের বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছে।'

'শুধু শুধু বসে আছে?'

'না, কি যেন করছে। ডাকব?'

'ডাক।'

ফরিদা ডাকতে গেলেন। এবং ফিরে এলেন কাউকে না-নিয়ে।

'ফিরোজ ঘুমাচ্ছে।'

'দুপুর এগারটায় কিসের ঘুম?'

ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। যদিও বিরক্ত হবার কোনোই কারণ নেই। জুন মাসের দুপুরবেলায় কারো চোখে ঘুম জড়িয়ে আসাটা অন্যায় নয়। তাঁর নিজেরই ঘুমঘুম পাচ্ছে।

ফরিদা বললেন, 'তোমার কী হয়েছে? এমন রেগে-রেগে কথা বলছ কেন?'

'রেগে রেগে কথা বলছি নাকি?'

'হুঁ। বেশ কয়েকদিন থেকেই লক্ষ করছি অল্পতেই ইউ আর লুজিং ইওর টেম্পার। তোমার ব্লাড প্রেসার কি বেড়েছে?'

'না।'

চেক করিয়েছ?'

'না।'

চেক না-করিয়ে কীভাবে বলছ, বাড়ে নি? আমার তো মনে হয় বেড়েছে। শম্ভুবাবুকে ডাকি?'

'কাউকে ডাকতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কাজ কর।'

'আমার আবার কী কাজ যে করব?'

ওসমান সাহেব বুঝতে পারছেন, তাঁর মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে। অসম্ভব খারাপ। এই মুহূর্তে তা চেক করা উচিত। রাগ সামলাবার কী-একটা পদ্ধতি যেন পড়েছিলেন বইয়ে। পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গোনা। কিন্তু তাঁর পায়ে জুতো। তিনি পায়ের নখের দিকে তাকাতে পারছেন না।

ফরিদা বললেন, 'তুমি এ-রকম করছ কেন?'

'কী রকম করছি?'

'অস্বাভাবিক আচরণ করছ।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই। আজ দশটায় তোমার বোর্ড মীটিং ছিল। কোনো কারণ ছাড়াই তা ক্যানসেল করেছ। এবং–।'

‘বল, কী বলতে চাও–থেমে গেলে কেন?

‘বেশ কিছুদিন থেকেই তুমি কোনো কাজকর্ম দেখছ না।’

‘তাতে কিছুই আটকে নেই ফরিদা। আমি বিশ্রাম করছি। আমি ক্লান্ত। আমার মতো বয়সের একটি মানুষের ক্লান্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।’

ফরিদা ওসমান সাহেবের পাশের চেয়ারে বসলেন। চেয়ারের দু’ হাতলে নিজের হাত তুলে দিলেন। বসার ভঙ্গি অনেকটা সিংহাসনে বসার মতো। ওসমান সাহেব তাঁর স্ত্রীর বসার এই ভঙ্গিটির সঙ্গে পরিচিত। এভাবে বসা মানেই, ফরিদা যুক্তি দিয়ে কিছু বলবে। সে-যুক্তিগুলো কিছুতেই ফেলে দেয়া যাবে না। ওসমান সাহেব বললেন, ‘বল, তুমি কী বলবে।’

ফরিদা সহজ কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললেন, ‘গত তিন-চার দিন ধরে তুমি এ-রকম আচরণ করছ এবং আমার মনে হয় ফিরোজের কোনো-একটা ব্যাপার তোমাকে এফেক্ট করেছে। সেটা কী?’

‘কিছুই না। ফিরোজের কোনো ব্যাপার নয়। ফিরোজ এখন সুস্থ।’

‘না, সে পুরোপুরি সুস্থ হয় নি।’

ফরিদার কণ্ঠ তীব্র ও তীক্ষ্ণ। ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। তিনি ভালো করেই জানেন, গত তিন দিন ধরে ফিরোজ খুবই অসুস্থ। তাঁর ধারণা, এই তথ্যটি তিনি একাই জানেন। এখন বুঝতে পারছেন, এ ধারণা সত্য নয়। ফরিদাও সেটি জানে।

ওসমান সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘আমার জন্যে এক কাপ চা দিতে বল।’

ফরিদা উঠলেন না। তিনি জানেন, ওসমান সাহেবের চায়ের পিপাসা হয় নি। আলোচনার মোড় ফেরাবার জন্যেই চায়ের প্রসঙ্গটা টেনে আনা।

ওসমান সাহেব বললেন, 'আজ বোধহয় বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি খুব দরকার।'

এই কথাটিও শুধু-শুধু বলা। মেঘ-বৃষ্টি-রোদ নিয়ে ওসমান সাহেব কখনো মাথা ঘামান না, তাঁর এত সময় নেই।

'ফরিদা।'

'বল।'

'ফিরোজের বর্তমান অবস্থাটা তুমি জান?'

'জানি।'

'কখন জানলে?'

'চার দিন আগে।'

'আমাকে বল নি কেন?'

'তুমিও তো জানতে। তুমিও তো আমাকে কিছু বল নি।'

'বাড়ির অন্যরা জানে?'

'জানি না। অন্যরা জানে কি না জিজ্ঞেস করি নি। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে নি।'

'মিসির আলি সাহেব জানেন? তাঁকে কিছু বলেছ?'

'না, আমি কিছু বলি নি।'

'আমার মনে হয়, তাঁকে ব্যাপারটা জানানো উচিত।'

'উচিত হলে জানাও।'

'আরো আগেই জানানো উচিত ছিল, তাই না ফরিদা?'

ফরিদা কোনো জবাব না দিয়ে উঠে গেলেন। তাঁর মাথা ধরেছে। তিনি খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবেন। রোজ দুপুরবেলায় তাঁর মাথা ধরে। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে হয়।

ওসমান সাহেব বারান্দায় উকি দিলেন। ফিরোজ ইজিচেয়ারে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুমাচ্ছে। নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। কে বলবে তার এত বড় সমস্যা আছে! সমস্যাটি ওসমান সাহেব তিন দিন আগে প্রথম লক্ষ করেন। রাত ন'টার দিকে রোজকার রুটিনমতো তিনি ফিরোজের ঘরে ঢুকলেন। ফিরোজ হাসিমুখে বলল, 'কি খবর বাবা?'

'কোনো খবর নেই। এলাম খানিকক্ষণ গল্পগুজব করতে। বেড-টাইম গসিপিং।'বস।'

'কী করছিস?'

'কিছু করছি না। পড়ছি।'

'কী পড়ছিস?'

'গল্প উপন্যাস এইসব, সিরিয়াস কিছু নয়।'

'মাঝে মাঝে অবশ্যি গল্প-উপন্যাসও বেশ সিরিয়াস হয়।'

'তা হয়। তবে আমি পড়ি হালকা জিনিস। এখন পড়ছি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নৌকাডুবি।'

'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস হালকা জিনিস। বলিস কি তুই?'

‘বেচারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে বলেই যে তাঁকে ভারি ভারি উপন্যাস লিখতে হবে, তেমন তো কোনো কথা নেই।’

ফিরোজ হাসতে শুরু করল। সহজ স্বাভাবিক হাসি। এক জন অসুস্থ মানুষ এ-রকম ভঙ্গিতে হাসতে পারে না। ওসমান সাহেব নিজেও হাসলেন এবং ঠিক তখনি একটা জিনিস লক্ষ করলেন।

ফিরোজের বিছানার ওপর প্রায় আড়াই হাত লম্বা একটা লোহার রড পড়ে আছে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘লোহার রডটা এখানে কেন?’

ফিরোজ তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

‘কে রেখেছে এটা এখানে?’

‘আমি।’

‘কেন?’

‘এমনি।’

‘এমনি মানে? বিছানার ওপর কেউ লোহার রড রাখবে কেন? ব্যাপারটা কি?’ ওসমান সাহেব লক্ষ করলেন, ফিরোজের মুখ কেমন যেন কঠিন হয়ে আসছে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। জ্বলজ্বল করছে।

‘দে আমার কাছে, বাইরে রেখে আসি।’

‘না।’

‘না মানে? এটা দিয়ে তুই কি করবি?’

ফিরোজ গম্ভীর গলায় বলল, ‘বাবা তুমি এখন যাও, আমি ঘুমাব।’

‘তুই ঘুমাবি, ভালো কথা, কিন্তু লোহার রড পাশে নিয়ে ঘুমাতে হবে কেন?’

‘ঘুমালে অসুবিধা কি?

‘অসুবিধা কিছুই নেই। কিন্তু সবকিছুর একটা কারণ আছে। তুই কারণটা আমাকে বল।’

‘না, বলব না।’

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ফিরোজের চোখ লাল হয়ে উঠছে। কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। ভারি ভারি নিঃশ্বাস ফেলছে। ওসমান সাহেবের মনে হল–’সামথিং ইজ রং। সামথিং ইজ ভেরি রং।

‘ফিরোজ।’

‘জ্বি?’

‘রড পাশে নিয়ে ঘুমানোর কারণটা আমাকে বল। প্লীজ! তুই একটি বুদ্ধিমান ছেলে। কারণ নেই, এমন কিছু তোর পক্ষে করা সম্ভব নয়।’

ফিরোজ টেনে-টেনে বলল, ‘ও আমাকে রাখতে বলেছে।’

‘কে রাখতে বলেছে?’

ঐ লোক।’

‘কোন লোক? তার নাম কি?’

‘নাম জানি না।’

‘লোকটা কে?’

‘খালিগায়ের একটা লোক। কালো প্যান্ট পরা, চোখে চশমা। সোনালি ফ্রেমের চশমা।’

ওসমান সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। কার কথা বলছে সে?

ফিরোজ বলল, 'মিসির আলি স্যারকে ঐ লোকের কথা আমি বলেছি। উনি চেনেন।'

'আই সি।'

'সে আমাকে বলেছে, লোহার রড সবসময় সঙ্গে রাখতে। যদি না রাখি, সে রাগ করবে।'

'এই ব্যাপারগুলো কি তুমি মিসির আলি সাহেবকে বলেছ?'

'জ্বি না।'

'বল নি কেন?'

'ঐ লোক আমাকে বলেছে এটা না বলতে।'

'আই সি।'

'বাবা, তুমি চলে যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'মাত্র সাড়ে ন'টা বাজে। এখনিই ঘুম পাচ্ছে কি? আরেকটু বসি। গল্প করি তোর সঙ্গে।'

'গল্প করতে ইচ্ছা করছে না। তুমি এখন যাও।'

তিনি চলে এলেন, কিন্তু সারারাত তাঁর ঘুম হল না। তাঁর মনে হতে লাগল– দরজায় একটা তালা লাগিয়ে রাখা উচিত, যাতে ফিরোজ কিছু বুঝতে না পারে। কিন্তু তালা লাগানোর সাহস তাঁর হল না। তালা লাগানোর ব্যাপারটা ফিরোজকে আরো এফেক্ট করবে। ভালোর চেয়ে মন্দ হবে বেশি।

ওসমান সাহেব ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকা ফিরোজের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী নিশ্চিন্তেই না ঘুমাচ্ছে সে! কে বলবে সে অসুস্থ! কত সহজ, কত

স্বাভাবিক ঘুমাবার ভঙ্গি। কোলের ওপর একটা বই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের– স্বপ্ন লজ্জাহীন। উপন্যাসটি কেমন কে জানে? সুনীলের কোনো বই পড়েন নি। গল্প-উপন্যাস তাঁর পড়া হয়ে ওঠে না।

ফিরোজ ঘুমের মধ্যেই নড়ে উঠল। ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে ডাকলেন, 'ফিরোজ।' ফিরোজ জবাব দিল না। তার পায়ের কাছে ভারি লোহার রডটি আছে। রডটি মাথা বেশ ধারাল। বারবার সেখানে চোখ আটকে যায়।

ওসমান সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তাঁর বারবার মনে হচ্ছে, এই লোহার রডটি ভয়ঙ্কর কোনোকিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

মিসির আলির সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তিনি নাকি ঢাকায় নেই। কোথায় গিয়েছেন কেউ বলতে পারে না। কবে ফিরবেন, তাও কারো জানা নেই।

৮

মোহনগঞ্জ স্টেশনে মিসির আলি নামলেন রাত সাড়ে সাতটায়। গায়ে প্রবল জ্বর। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। চোখ মেলতে পারছেন না, এ-রকম অবস্থা। তাঁর নিজের বোকামির জন্যে এটা হয়েছে।

শ্যামগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। কামরায় লেখা 'পঁচিশ জন বসিবেন।' বসেছে পঞ্চাশ জন। আরো পঞ্চাশ জন দাঁড়িয়ে। অসম্ভব গরম। বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে আসছে উৎকট দুর্গন্ধ। বারবার মিসির আলির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। নরক-যন্ত্রণা বোধ হয় একেই বলে। যাত্রীদের মধ্যে এক জন রোগী আছে, যে কিছুক্ষণ পরপর গোঁ-গোঁ শব্দ

করছে। সেই শব্দ শুনে মনে হয়, এক্ষুণি বোধ হয় তার প্রাণবিয়োগ হবে। ভয়াবহ অবস্থা!

মিসির আলি শ্যামগঞ্জ নেমে পড়লেন। খোলা জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বুক ভর্তি করে নিঃশ্বাস নেবেন, এ-আশায়। ট্রেন ছাড়ার সময় হঠাৎ মনে হল– ছাদে বসে গেলে কেমন হয়? অনেকেই তো যাচ্ছে। বাতাসের অভাব হবে না সেখানে। গ্রামের ভেতর দিয়ে ট্রেন যাবে, টাটকা বাতাস পাওয়া যাবে। তিনি ছাদে উঠে পড়লেন।

ছাদের অবস্থা বেশ ভালো। চমৎকার হাওয়া। মিসির আলি নিজেকে ধন্যবাদ দিলেন, ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি নেবার জন্যে।

সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না। হিরণপুর আসবার আগেই আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। প্রবল বাতাস বইতে শুরু করল। ধরবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। তাঁর মনে হতে লাগল, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে চষা খেতে ফেলবে। জীবনের ইতি হবে সেখানেই। বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে বর্ষণ। বৃষ্টির ফোঁটা সুচের মতো গায়ে বিধছে। আর কী ঠাণ্ডা! যেন বরফের চাঁই থেকে গলে গলে পড়ছে।

একটা ভালো অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার কথা অন্যকে বলার মতো সুযোগ কি আর হবে? মিসির আলি বাতাসের ঝাপ্টা সামলাবার চেষ্টা করছেন। ছাদের ওপরে বসা মানুষগুলোর কেউ-কেউ আজান দিতে শুরু করেছে। আল্লাহকে খুশি করার একটা চেষ্টা। আল্লাহ্ খুশি হলেন কি না বোঝা গেল না–ঝড়-বৃষ্টি কিছুই কমল না, তবে ড্রাইভার ট্রেন দাঁড় করিয়ে

ফেলল। ছাদের ওপরে বসে-থাকা অসহায় মানুষগুলোর আজানের শব্দ নিশ্চয়ই তাঁর কানে গিয়েছে। আজানের ধ্বনি একেবারে বৃথা যায় নি। ঝড় আধ ঘন্টার মতো স্থায়ী হল। এবং পরের কুড়ি মিনিটের মধ্যে মিসির আলির গায়ের তাপ হুহু করে বাড়তে লাগল! মোহনগঞ্জ স্টেশনে নেমে তাঁর মনে হল, প্লাটফরমেই শুয়ে পড়েন।

'স্যার, আপনি কি মিসির আলি?'

'হুঁ।'

'আমি চৌধুরীবাড়ি থেকে আপনাকে নিতে এসেছি স্যার।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনি কোন ট্রেনে আসবেন সেটা বলেন নাই, আমি সকাল থেকে সব ক'টা টেন দেখছি।'

'খুব কষ্ট দিলাম–না?'

'জ্বি স্যার, তা দিলেন।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন। বেশ ছেলেটি। বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট। কথাবার্তায় কোনো গ্রাম্য টান নেই।

'কি কর তুমি?'

'এখানকার কলেজে স্যার বি. এ. পড়ি। চৌধুরীবাড়িতে থাকি।'

'নাম কি তোমার?'

'জহুরুল হক।'

'জহুরুল হক সাহেব, চল রওনা হওয়া যাক।'

‘চলুন। আপনার মালপত্র কোথায়?’

‘মালপত্র কিছুই নেই। একটা হ্যাণ্ডব্যাগ ছিল, সেটা বাতাসে উড়ে গেছে।‘

‘বাতাসে উড়ে গেছে মানে?’

‘ছাদে বসে এসেছি তো—-ঝড়ের মধ্যে পড়েছি।’

‘বলেন কী! কী সর্বনাশ!’

‘শোন জহুরুল–এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা কী? আমার কিন্তু হাঁটার ক্ষমতা নেই।

‘হাঁটা ছাড়া তো যাওয়ার অন্য কোনো ব্যবস্থাও নেই। নদীতে এখনো পানি হয় নি, নৌকা চলে না।‘

মিসির আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পথে নামলেন। সেখানে আবার তাঁকে বৃষ্টিতে ধরল।

.

তাঁর জ্বরের ঘোর কাটতে দু’ দিন লাগল। পুরোপুরি আচ্ছন্ন অবস্থা গেল এ দু’ দিন। সবকিছু স্বপ্নদৃশ্যের মতো। যা দেখেন, তাই মনে হয় কাটা-কাটা খণ্ডচিত্র। একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই।

একটি অপরূপা রূপবতী মেয়েকে প্রায়ই উদ্বিগ্ন মুখে তাঁর পাশে বসে থাকতে দেখেন। এই মেয়েটিই বোধহয় নাজনীন। মেয়েটি মাথায় পানি ঢালে। মাথার চুল টেনে দেয় এবং অত্যন্ত নরম স্বরে জিজ্ঞেস করে, ‘চাচাজী, এখন কি একটু ভালো লাগছে? বলুন, ভালো লাগছে?

তাঁর ভালো লাগে না। তবু মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলেন, 'ভালো লাগছে মা, বেশ ভালো লাগছে।'

এক জন বয়স্কা মহিলাকেও প্রায় সর্বক্ষণই তাঁর ঘরের চেয়ারে বসে থাকতে দেখেন। ইনি বোধহয় নাজনীনের মা। এই মহিলাটি কথাটথা বলেন না।

চব্বিশ ঘন্টা থাকবার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁকে থাকতে হল এক সপ্তাহ। চার দিনের দিন তিনি নিজের ঘর থেকে বেরুলেন এবং খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আবার জ্বর বাঁধিয়ে ফেললেন। সেই জ্বর পুরোপুরি ছাড়ল না কখনো। তবু এর মধ্যেই যে-সব কাজ করবার কথা, সব করলেন।

প্রথম কাজ ছিল ফিরোজ এসে যে-সব জায়গায় গিয়েছে, সে-সব জায়গায় যাওয়া।

দেখা গেল, সে খুব বেশি বেড়ায় নি। বাড়ি এবং শিয়ালজানি খাল—এ দু'য়ের মধ্যেই তার গতিবিধি সীমিত ছিল। এক দিন শুধু 'উত্তরবন্ধ' বিলে গিয়েছিল মাছ ধরা দেখতে। সেখানে সে নিজেই নেমেছিল মাছ মারতে। তখন শিং মাছ কাটা ফুটিয়ে দেয়। সে ভয়ে অস্থির হযে পড়ে। তার ধারণা, সাপে কেটেছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কারণ, ঘটনাটি ঘটে তার অসুস্থ হবার আগের দিন। খুব সম্ভব ঘটনাটি তার মনের ওপর ছাপ ফেলে। রাতে তার একটু জ্বরজ্বরও হয়।

যে বটগাছের নিচে চশমাপরা লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সেই গাছটিও তিনি দেখতে গেলেন। এবং গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হল,

ঘটনাটি এখানে ঘটে নি। ফিরোজের বর্ণনা অনুসারে জায়গাটা নির্জন। দু'একটা পরিত্যক্ত হিন্দু ঘরবাড়ি ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু বটগাছটা যে-অঞ্চলে, সে জায়গাটা নির্জন নয়। পাশেই শিয়ালজানি খালের ওপর একটি বাঁশের সাঁকো, যার ওপর দিয়ে লোকজন চলাচল করছে। নদীর ওপারেই কয়েক ঘর কুমোরের বাস। তাদের বাড়িভর্তি ছেলেমেয়ে, যারা খুব হৈচৈ করে খেলে। এই অঞ্চলটিকে নির্জন বলা চলে না।

ঘটনাটি নিশ্চয়ই অন্য কোথাও ঘটেছে এবং ফিরোজ ঘোরের মধ্যে হেঁটে-হেঁটে চলে এসেছে বটগাছের নিচে, যেখানে অন্য লোকজন তাকে দেখতে পায়।

মিসির আলি শিয়ালজানি খালের দু'পার ধরে প্রচুর খোঁজাখুঁজি করলেন, কোনো বকুল গাছ পাওয়া যায় কি না। পাওয়া গেল না।

তাঁর দ্বিতীয় কাজ ছিল, এখানে আসার পর ফিরোজের সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ করা। জানতে চেষ্টা করা, তারা ফিরোজের আচার ব্যবহারে কোনো অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছে কি না। দেখা গেল, খুব অল্পকিছু লোকজনের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। কেউ তেমন কিছু বলে নি। মিসির আলি প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ইন্টারভ্যুর খুটিনাটি লিখে ফেললেন। কয়েকটি নমুনাঃ

মোসাম্মাৎ সালেহা বেগম

বয়স ৫০/৫৫। আজমল চৌধুরীর মা। পর্দানশিন। কম কথা বলেন। রাতে চোখে ভালো দেখতে পান না।

প্রশ্ন : ফিরোজ ছেলেটি কেমন?

উত্তর : ভালো।

প্রশ্ন : কেমন ভালো?

উত্তর : এত বড় লোকের ছেলে, কিন্তু অহঙ্কার নাই।

প্রশ্ন : বুঝলেন কী করে অহঙ্কার নেই?

উত্তর : আমার পা ছুঁয়ে সালাম করল।

প্রশ্ন : যে দিন সে অসুস্থ হয় সে-দিন, অর্থাৎ অসুস্থ হবার আগে কি তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

উত্তর : হয়েছিল, চা খাওয়ার সময়।

কোনো কথা হয়েছিল?

প্রশ্ন : উত্তর : না।

প্রশ্ন : ওকে দেখে কি আপনার একটু অন্যরকম লাগছিল?

উত্তর : না। তবে চোখ-মুখ ফোলা ছিল। রাতে ঘুম হয় নি, সে-জন্য বোধহয়।

প্রশ্ন : বুঝলেন কী করে, ওর রাতে ঘুম হয় নি? কারণ আপনার সঙ্গে তো শুর কোনো কথা হয় নি।

উত্তর : সে আজমলের কাছে বলছিল, তাই শুনলাম।

প্রশ্ন : আপনি জিজ্ঞেস করেন নি, কী জন্যে ঘুম হয় নি?

উত্তর : না।

নাজনীন সুলতানা

বয়স ২০/২১। মমিনুন্নেসা কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে বাড়িতে আছে। অপরূপ রূপবতী। মায়ের মতো স্বল্পভাষী নয়। ইনহিবিশন কেটে গেলে প্রচুর কথা বলে। লাজুক নয়। কথাবার্তায় মনে হল অত্যন্ত জেদি, তবে হাসিখুশি ধরনের মেয়ে।

প্রশ্ন : কেমন আছ নাজনীন?

উত্তর : ভালো আছি চাচা, আপনি এমন খাতা-কলম নিয়ে প্রশ্ন করছেন কেন? আমার কাছে মনে হচ্ছে, আমি কোনো পত্রিকায় ইন্টারভ্যু দিচ্ছি।

প্রশ্ন : ফিরোজকে তোমার কেমন লেগেছিল?

উত্তর : ভালো।

প্রশ্ন : কেমন ভালো?

উত্তর : বেশ ভালো! (এই পর্যায়ে মেয়েটি ঈষৎ লজ্জা পেয়ে গেল।)

প্রশ্ন : ঠিক কী কারণে তুমি বলছ, বেশ ভালো?

উত্তর : জানি না কী কারণে।

প্রশ্ন : ফিরোজ অসুস্থ হবার পেছনে কি কোনো কারণ আছে বলে মনে হয়?

উত্তর : এইসব নিয়ে আমি কখনো ভাবি নি চাচা।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ফিরোজ অসুস্থ হয়ে তোমাদের বাড়িতে এল। সে-সময় তুমি তার সামনে গিয়েছিলে? তোমাকে কি সে চিনতে পেরেছিল?

উত্তর : চিনতে পেরেছিলেন কি না, তা তো চাচা বলতে পারব না। তবে উনি খুব হৈচৈ করছিলেন, আমাকে দেখে হৈচৈ থামিয়ে ফেলেন। রাতের

বেলাও খুব চিৎকার শুরু করলেন। তখন ভাইয়া আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমকে দেখে চুপ করে গেলেন।

প্রশ্ন : আচ্ছা, এখন আমি একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। জবাব দিতে না চাইলে জবাব দিও না। প্রশ্নটি হচ্ছে–ধর, ফিরোজ যদি এখন পুরোপুরি সেরে যায় এবং তোমাকে বিয়ে করতে চায়, তুমি কি রাজি হবে?

উত্তর : (খুব সহজ এবং শান্ত গলায়) হ্যাঁ, হব। চাচা, আজকের মতো থাক। আপনার জন্যে এখন শরবত নিয়ে আসি–নাকি চা খাবেন? আপনি খুব ঘনঘন চা খাচ্ছেন–এটা কিন্তু চাচা ভালো না।

হরিপ্রসন্ন রায়

এম. বি. বি. এস.

স্থানীয় ডাক্তার। বয়স ৪০/৪৫। ব্যস্তবাগীশ লোক। এ অঞ্চলে তাঁর খুব পসার আছে। ইন্টারভ্যু চলাকালেই দু' জন লোক তাঁকে নিতে এল। কথা বেশি বলেন।

প্রশ্ন : আপনি কখন রুগীকে দেখতে এলেন?

উত্তর : আমাকে খবর পাঠিয়েছে পাঁচটায়। তখন যাওয়ার উপায় ছিল না। কারণ ধর্মপাশা থেকে এক জন পেসেন্ট এসেছে, এখন-তখন অবস্থা। পেটের ব্যথা। আলসার ছিল, সেই পেইন, কাজেই আমি সন্ধ্যার পরে গিয়ে উপস্থিত হই। ধরুন ছ'টা সাড়ে ছ'টা। শীতকাল তো ছ'টার সময় চারদিক অন্ধকার। আপনি কী দেখলেন? মানে রুগীর অবস্থার কথা বলছি।

প্রশ্ন : উত্তর : গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। হিস্টিরিয়ার লক্ষণ মনে হল। চোখ বড়-বড় করে ঘোরাচ্ছিল। ভয়াবহ অবস্থা! আমি নাড়ি দেখলাম। হার্টবিট ছিল খুব হাই। হিস্টিরিয়াতে এ রকম হয়।

প্রশ্ন : অষুধপত্র কী দিলেন?

উত্তর : তেমন কিছু না। ঘুমের অষুধ দিয়েছি, ফেনোবারবিটন। তারপর বললাম ইমিডিয়েটলি ঢাকা নিয়ে যেতে।

প্রশ্ন : কতক্ষণ ছিলেন আপনি?

উত্তর : রাত দশটা পর্যন্ত ছিলাম। ওরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। নাজনীন কান্নাকাটি করছিল। কাজেই রুগী ঘুমিয়ে না-পড়া পর্যন্ত ছিলাম।

প্রশ্ন : ঘুমের মধ্যে রুগী কি কোনো কথাবার্তা বলছিল?

উত্তর : না, সাউণ্ড ঘুম। আমি ঘুমের মধ্যে আরে কবার নাড়ি দেখলাম। হার্টবিট বেশি ছিল, তবে আগের চেয়ে কম। কত ছিল তা মনে নেই।

প্রশ্ন : গায়ে টেম্পারেচার ছিল?

উত্তর : আমি যখন দেখি, তখন অল্প ছিল। নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ। আমি চলে আসার সময় বলেছিলাম, সকালবেলা আবার দেখব। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নি। ভোর পাঁচটার ট্রেনে রুগীকে নিয়ে তারা ঢাকা চলে যায়।

জহুরুল হক

বয়স ২০/২১। স্থানীয় কলেজের ছাত্র। বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট। চৌধুরীদের বাড়ি লজিং থাকে। এদের সঙ্গে ক্ষীণ আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। কথাবার্তা শুনে ধারণা হল, নাজনীন মেয়েটির প্রতি সে খানিকটা অনুরক্ত।

প্রশ্ন : ফিরোজের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল?

উত্তর : জ্বি-না। আমি একটু দূরে দূরে ছিলাম। প্রশ্ন : দূরে-দূরে ছিলে কেন?

উত্তর : আজমল ভাই সব সময় তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে থাকতেন। আমি আজমল ভাইকে সব সময় এড়িয়ে চলি। তাঁকে ভীষণ ভয় পাই। কাজেই......।

প্রশ্ন : ভয় পাও কেন?

উত্তর : আজমল ভাই ভীষণ রাগী। চট করে রেগে যায়। ওদের ফ্যামিলির সবাই খুব রাগী। এখনো ওদের মধ্যে কিছুটা জমিদার-জমিদার ভাব আছে। সবাইকে মনে করে ছোটলোক।

প্রশ্ন : ফিরোজ কেন অসুস্থ হয়েছিল বলে তোমার ধারণা?

উত্তর : জানি না কেন হয়েছে। তবে লোকে বলে, ওরা ধুতুরার বীজ খাইয়ে পাগল করে ফেলেছে।

প্রশ্ন : বল কী তুমি!

উত্তর: না, আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। লোকে কী বলে, সেটা বললাম।

প্রশ্ন : লোকে এ-জাতীয় কথা কেন বলছে?

উত্তর : এদের পূর্বপুরষরা খুব অত্যাচারী জমিদার ছিল। এরা মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে দিয়েছিল। এরা প্রচুর অন্যায় করেছে, সেই জন্যেই এ-সব বলে।

প্রশ্ন : তুমি মনে হয় এদের ওপর রেগে আছ?

উত্তর : না, রাগব কেন? সত্যি কথাটা আপনাকে বললাম।

মোহনগঞ্জে আসায় মিসির আলি সাহেবের তেমন কোনো লাভ হয় নি। এখন পর্যন্ত এমন কোনো তথ্য পান নি, যেটা তাঁর কোনো কাজে আসবে। চট করে অবশ্যি কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। খুঁজতে হয়। জট খোলবার প্রথম ধাপই হচ্ছে অনুসন্ধান। অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো কোনো আলোর ইশারা থাকতে হবে। সে-রকম কোনো আলোর সন্ধান মিসির আলি এখনো পান নি।

তবে যাবার দিন ভোরবেলায় একটি সূত্র পাওয়া গেল। অস্বস্তিকর একটি সূত্র, যাকে গ্রহণ করাও যায় না, আবার ফেলে দেয়াও যায় না। নাজনীন এসে বলল, ‘চাচা, আসুন, আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাব।’

‘কী মজার জিনিস?

‘আমাদের এক পূর্বপুরুষ পিতলের একটা কলসি পেয়েছিলেন। কলসিভর্তি ছিল মোহর। সেই মোহর পেয়েই তারা জমিদার হল।’

‘কলসিটায় কোনো বিশেষত্ব আছে?’

‘না। সাধারণ কলসি, তবে অমাবস্যার সময়ে এটা ঝনঝন শব্দ করে।’

‘তুমি নিজে শুনেছ?’

'না, তবে অনেকেই শুনেছে। আমি আর ভাইয়া এক অমাবস্যার রাতে কলসির পাশে জেগে ছিলাম। কিচ্ছু শুনতে পাই নি।'

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, 'প্রাচীন মোহরভর্তি কলসি–এ-জাতীয় গল্প খুব প্রচলিত। তবে এ-সবের কোনো ভিত্তি নেই।'

'চাচা, অনেকেই কিন্তু শব্দ শুনেছে।

'হয়তো ইঁদুর ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। ইঁদুর শব্দ করেছে।'

মিসির আলি কলসি দেখার জন্যে কোনোরকম আগ্রহ বোধ করলেন না। শুধুমাত্র নাজনীনের মনরক্ষার জন্যে সঙ্গে গেলেন। দোতলার উত্তরের সবচেয়ে শেষের ঘরটির তালা খুলল নাজনীন। মিসির আলির শিরদাঁড়া দিয়ে একটি ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। কলসির কারণে নয়। এ-ঘরে কয়েকটি পুরনো পেইনটিং আছে। তাদের একটিতে খালি-গায়ে একটি লোক ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। তার পরনে কালো রঙের প্যান্ট। চোখে সোনালি চশমা। শুকনো ধরনের কঠিন একটি মুখ।

'নাজনীন, এ-ছবিটা কার?

'আমার দাদার বাবা। উনি খালিগায়ে ঘোড়ায় চড়তেন।'

'নাম কি ওঁর?'

'মাসুক চৌধুরী।'

'ওঁর সম্পর্কে আর কী জান তুমি?'

'বিশেষ কিছু জানি না। শুনেছি, খুব অত্যাচারী ছিলেন। তারপর এক দিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন। হঠাৎ প্রজারা তাঁকে ঘিরে ফেলে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কি? মেরে ফেলে। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মারে।—চাচা, এই দেখুন কলসি। আবার কি কি যেন লেখাও আছে গায়ে। চেষ্টা করে দেখুন, পড়তে পারেন কি না। পালি ভাষায় লেখা।'

লেখা পড়ার ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করলেন না। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তোমার দাদার বাবাকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মারে?'

'হ্যাঁ। ওঁর কথা এত জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, ফিরোজ কি এই ঘরটি দেখেছে? সে কি এই ঘরে ঢুকেছিল?'

'জ্বি না।'

'কী করে বুঝলে ঢোকে নি?'

'কারণ, ঘরটা তালা দেয়া থাকে। এই তালার একটিমাত্র চাবি। সেই চাবি থাকে আমার কাছে।'

'জানালা-টানালা দিয়ে এই ঘরে ঢোকার কোনো উপায় নেই, তাই না?'

'উঁহু, আর উপায় থাকলেই শুধু শুধু জানালা দিয়ে ঢুকতে যাবেন কেন? কী আছে এই ঘরে?'

মিসির আলি দাঁড়িয়ে রইলেন ছবির সামনে। তাঁর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমছে। তিনি জট খুলতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু জট খুলছে না। আরো পাকিয়ে যাচ্ছে। ফিরোজ যদি এক বার এই ঘরে ঢুকত, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই অনেক সহজ হয়ে যেত। তিনি বলতে পারতেন–ফিরোজ এই

ছবিটি দেখেছে। তার মনে ছাপ ফেলেছে এই ছবি। পরবর্তী সময়ে ছবির মানুষটিকেই সে দেখেছে। হেলুসিনেশন। কত সহজ সমাধান।

কিন্তু ফিরোজ এই ছবি দেখে নি।

মিসির আলি বললেন, 'একটিমাত্র চাবি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি নিশ্চিত যে এই ঘরের দ্বিতীয় কোনো চাবি নেই?'

'হ্যা, নিশ্চিত।'

মিসির আলি আবার তাকালেন ছবির দিকে। তাঁর কেন জানি মনে হল, ছবির মানুষটি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। বিদ্রুপের হাসি। তাচ্ছিল্যের হাসি।

৯

নীলু পত্রিকার খবরটা চারবার পড়ল।

একটা লাল কলম দিয়ে বক্স করা খবরটির প্রতিটি লাইন দাগাল, তারপর কাগজটা তার বাবাকে দিয়ে এল। খবরটা এ-রকম-

পুরানা পল্টনে আতঙ্ক

(স্টাফ রিপোর্টার)

শুক্রবার রাত একটার দিকে পুরানা পল্টন এলাকায় মধ্যযুগীয় নাটকের অবতারণা হয়েছে। লোহার রড হাতে এক যুবক অত্র অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুযায়ী উক্ত যুবকটির পরনে ছিল কালো

প্যান্ট। গায়ে কোনো কাপড় ছিল না। সে প্রথমে একটা রাস্তার কুকুর পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং তার পরপরই গাড়ি বারান্দায় শুয়ে থাকা কিছু ছিন্নমূল মানুষকে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবশত কেউ হতাহত হয় নি। চিৎকার এবং হৈচৈ শুনে প্রচুর লোকজন জমে যায় এবং যুবকটি পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। নীলক্ষেত পুলিশ-ফাঁড়ির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। ফাঁড়ি কর্তৃপক্ষ জানান যে, এই প্রসঙ্গে তাঁরা কিছুই জানেন না।

জাহিদ সাহেব খবরটা পড়লেন। কিন্তু তাঁর কোনো ভাবান্তর হল না। পত্রিকা খুললেই এ-জাতীয় খবর থাকে। বাংলাদেশের কোথাও-না-কোথাও কেউ-না-কেউ ত্রাসের সৃষ্টি করছে। একবার খবর বেরুল, ছোট-ছোট শিশুদের পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। একবার বেরুল, রক্তচোষার আগমন ঘটেছে। এরা কাউকে একা পেলেই ধরে বেঁধে সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে সমস্ত রক্ত নিয়ে যাচ্ছে। খলিলুল্লাহ্ বলে এক লোককে নিয়ে প্রচুর হৈচৈ হল। এই লোকটির প্রধান খাদ্য নাকি মৃত মানুষের কলিজা। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কতটুকু সত্যি কে জানে!

জাহিদ সাহেবের ধারণা, এ-জাতীয় খবরের বেশির ভাগই রিপোর্টাররা চা-সিগারেট খেতে খেতে তৈরি করেন। মানুষের কৌতূহল জাগিয়ে পত্রিকার কাটতি বাড়ান। এ জাতীয় খবরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, বেশ কয়েকটি ফলো আপ স্টোরি ছাপা হবে। এবং সবেশেষে একটি সচিত্র ফিচারের মাধ্যমে ঘটনার ইতি হবে। অতঃপর রিপোর্টাররা অন্য কোনো

ভয়াবহ ঘটনা ফাঁদতে চেষ্টা করবেন—'অজ্ঞাতনামা জন্তু' বা এই জাতীয় কিছু।

কিন্তু নীলু এই খবরটি এভাবে দাগিয়েছে কেন? বর্তমানে নীলুর কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। সে কি সেই ক্ষমতার কারণেই কিছু আঁচ করছে?

দুপুরবেলা খাবার সময় জাহিদ সাহেব প্রসঙ্গটা তুললেন। হালকা গলায় বললেন, 'পুরানা পল্টনে আতঙ্ক, এই খবরটা তুই দাগিয়েছিস কেন?'

নীলু জবাব দিল না। তার মুখ থমথমে। জাহিদ সাহেব বুঝলেন, নীলু এখন কোনো কথারই জবাব দেবে না। মাঝে-মাঝে সে এ রকম চুপ করে যায়। প্রয়োজনীয় কথাটাও বলে না।

জাহিদ সাহেব মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিজের মনে বললেন, 'দরজা-টরজা ভালোমতো বন্ধ করে ঘুমানো উচিত। বলা তো যায় না! পল্টন আর কাঁঠালবাগান–খুব একটা দূরের ব্যাপার না।'

তাঁর এ-সব বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেয়েকে আলোচনায় টেনে আনা। কিন্তু নীলু একটি কথাও বলল না। খাওয়ার মাঝখানেই সে উঠে চলে গেল।

জাহিদ সাহেব যা ভেবেছিলেন, তাই। ফলো-আপ স্টোরি ছাপা হয়েছে। খবর চলে এসেছে প্রথম পাতায়। আকর্ষণীয় শিরোনাম।

নগ্নগাত্র বিভীষিকা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পহেলা জুলাই, শনিবার, পুরানা পল্টন এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী যুবক আবার আজ গভীর রাতে দেখা দিয়েছে। যথারীতি তার হাতে ছিল লোহার রড। এবার তার রডের আঘাতে রাহেলা নাম্নী এক পতিতা গুরুতর আহত হয়। তার ডান হাত এবং পাঁজরের দুটি হাড় ভেঙে যায়। তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাহেলার বর্ণনা অনুযায়ী রাত আনুমানিক দুই ঘটিকার সময় নগ্নগাত্র যুবক একটি সুঁচাল লোহার রড নিয়ে উপস্থিত হয় এবং—।

নীলু আজও খবরটির চারদিকে লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিল। তারপর বাবাকে খবরের কাগজটি দিয়ে বলল, 'বাবা, আমাকে একটা কাজ করে দেবে?'

'নিশ্চয়ই দেব। কাজটা কী?'

'আমি মিসির আলি স্যারকে চিঠি লিখেছি। ঐটি তাঁকে পৌঁছে দেবে। তিনি অবশ্যি এখনো ঢাকায় ফেরেন নি। তুমি দরজার নিচ দিয়ে রেখে আসবে, যাতে আসামাত্র পেয়ে যান।'

জাহিদ সাহেব বিস্মিত হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। নীলু বলল, 'স্যারের খুব বিপদ। খালিগায়ে ছেলেটি স্যারকে মেরে ফেলবে। তাঁকে সাবধান করা দরকার।'

'বলিস কী!'

'আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি। তুমি এক্ষুণি যাও। খামের ওপর ঠিকানা লেখা আছে। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু আমার ভালো লাগছে না।'

জাহিদ সাহেব দেখলেন, খামের ওপর পুরানা পল্টনের ঠিকানা লেখা।

9 porrzonto ase